শতাব্দীর সূর্য্য

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশক—

শ্রীবরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

আত্মশক্তি লাইব্রেরী

১৫ নং কলেজ স্কোয়ার—কলিকাতা।

বৈশাখ ১৩৩৫

প্রিণ্টার :—শ্রীশশিভূষণ পাল,

মেট্‌কাফ্‌ প্রেস্‌;

১৫ নং নয়নচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট্‌,—কলিকাতা

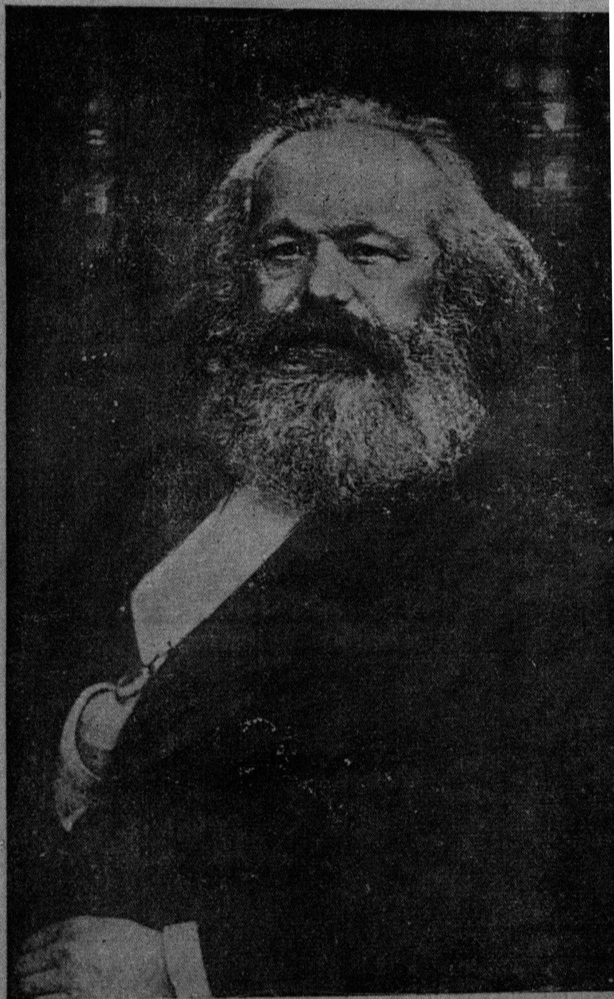
নিবেদন

নানা বিঘ্ন, বিপদের মধ্য দিয়া "শতাব্দীর সূর্য্য" প্রকাশিত হইল। শারিরীক অসুস্থতার দরুণ মাঝে মাঝে যে মুদ্রাকর-প্রমাদ রহিয়া গিয়াছে তাহার জন্ম সুধী পাঠকবর্গের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

বিভিন্ন পত্রিকায় যে ভাবে প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল—সেই ভাবেই এখানে সংবদ্ধ করা হইয়াছে।

কোনও আন্দোলনের অথবা ব্যক্তির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের জন্য প্রবন্ধগুলি রচিত হয় নাই। রচনা গুলির উদ্দেশ্য শুধু—বৃহত্তর জগতের কর্ম্ম-সাধনার সঙ্গে পরিচয় ঘটাইয়া দেওয়া। পাঠকের মনে যদি এই আত্মীয়তার সম্বন্ধ-বোধ জাগে—তাহা হইলে রচনাগুলি সার্থক হইবে।

সূচীপত্র



কার্ল মার্কস্

শতাব্দীর সূর্য্য

কার্লমার্কস্ ও সাম্যবাদ

এক

মানবের চিন্তার ইতিহাসে কার্লমার্কস্ একজন যুগপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষ। তাঁর আগমনে পৃথিবীর চিন্তার ধারা ও জীবন পদ্ধতি একেবারে একটা নূতন দিক নিয়েছে এবং সে দিকটা পৃথিবীর এত দিনের প্রচলিত জীবনধারার ও রীতিনীতির সম্পূর্ণ বিপরীত। এই নূতন দর্শনকে সাম্যবাদ বলা হয় এবং কার্লমার্কস্ই এর প্রতিষ্ঠাতা।

সাম্যবাদী মতকে সমগ্র পৃথিবী অভ্রান্ত বলে গ্রহণ করেন। এই নীতি নিয়ে সমস্ত জগতে বিরাট দ্বন্দ্ব চলেছে, কিন্তু এই নীতির প্রবর্ত্তক মার্কসের অপূর্ব্ব মণীষা ও চিন্তাশক্তি এবং

কল্যাণকামনাকে সমস্ত জগৎ শ্রদ্ধা করে। এ কথা আমরা সবাই জানি যে মার্কসের নীতি অবলম্বন করেই রুষিয়ায় বোলশেভিসিমের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। বোলশেভিক উত্থানের মূলে তিনটী জিনিষ ছিল—জারের অত্যাচার, কার্লমার্কস্ এবং লেনিনের ব্যক্তিত্ব ও কর্ম্মশক্তি।

কার্লমার্কস্ জগতের চিরাচরিত বহু আদর্শকে ভেঙ্গে নূতন এবং সম্পূর্ণ বিপরীত আদর্শ স্থাপন করে গেছেন।

মার্কস্ সমাজের বিবর্ত্তনকে এক নূতন ভাবে দেখেন। তিনি বলেন মানব সমাজ আদিম যাযাবর অবস্থার পর আপনার অজ্ঞাতসারে ছুটী প্রতিদ্বন্দ্বী ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়—এক ভাগের নাম দিয়েছেন Capitalistic মূলধন-ওয়ালা অর্থাৎ জগতের সম্পত্তির এবং সমস্ত দ্রব্য স্বষ্টির ক্ষমতা ও অধিকার এঁদের হাতে, আর একদল হল Proletariate অর্থাৎ সর্ব্বহারা; এদের কোনও সম্পত্তি নেই—এঁরা শুধু শ্রমের উপর জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। মার্কস্ অতীত ইতিহাস থেকে আরম্ভ করে আজ পর্য্যন্ত সমাজের ইতিহাস এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ভাগে বিভক্ত দেখিয়েছেন। একেই মার্কসের Class-Society বলে এবং এদের একত্র থাকার দরুণ যে সামাজিক বিবর্ত্তন চলেছে তাকে Class-Struggle বলা হয়।

মার্কসের বিষয় বা মার্কস্ নীতির বিষয় বলতে গেলেই আর একটী নূতন কথার সঙ্গে পরিচিত হতে হয়—তাকে Dialectic method (বিশ্লেষণ-পন্থা) বলে। অবশ্য এর অনুবাদটা

কার্ল মার্কস্ মন। এর জন্মদাতা বিখ্যাত জার্মান আদর্শবাদী দার্শনিক Hegel.

কার্ল মার্কস্‌কে বোঝার জন্তে সর্ব্ব প্রথমে হেগেলকে বোঝা একান্ত আবশ্যক।

ডায়েলিক্টিক্ পদের দ্বারা প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিতরা প্রশ্ন ও উত্তরের (discourse and re-joinder) পদ্ধতিকেই বুঝতেন। তর্কের এইরূপ প্রথার দ্বারা বিরোধী ভাবের (contradiction and antithesis) নিবৃত্তি করা হয়।

সামাজিক বিবর্ত্তনের ধারণা মার্কস্ হেগেলের নিকট হতে পেয়েছেন। হেগেলের মতে প্রকৃতি ও ইতিহাস বিবর্ত্তনের ক্রমিক গতির নামান্তর মাত্র। তাঁর মতে এই বিবর্ত্তনের কাজ পরিচালিত হয় আইডিয়া (Idea) ভাবের অথবা পরমাত্মার দ্বারা। মার্কস্ কিন্তু হেগেলের এ কথা মানেন না। তিনি বলেন, ইকনমিক্ ফোর্স অর্থাৎ অর্থ-নীতিক শক্তিই হচ্ছে যাবতীয় সামাজিক বিবর্ত্তনের মূল কারণ। সমাজের ভাঙা গড়া—এক স্তর হতে নিত্য আর এক স্তরে যাওয়া—এ সবই ইকনমিক্ ফোর্সের দ্বারা সম্পাদিত হচ্ছে। এই মতকে মার্কসের বিখ্যাত Mater-ialtistic conception of History বলা হয়। সমাজের প্রত্যেক স্তরই তার নিজের মধ্যে একটা ভাঙার কারণ সৃষ্টি করছে এবং প্রত্যেক ভাঙার পরে একটা নবীন ও উচ্চতর স্তরের সৃষ্টি হচ্ছে। সৃষ্টি বরাবর বিরোধের দ্বারাই হয়েই থাকে। পৃথিবীটা চিরকালই যদি একটা অগ্নি ও বাষ্পময় পিণ্ড

হয়ে থাকত এবং তার বিরুদ্ধ শক্তিরূপে কোনও শীতল পদার্থ না থাকত, তা হলে আজকের দিনে তাতে জীবের বাস কিছুতেই সম্ভবপর হত না। ষ্টেট অর্থাৎ গবর্ণমেন্ট যদি চিরকালই যথেচ্ছাচারী থাকত এবং তার বিরোধী কোনও শ্রেণীর সৃষ্টি না হত তাহলে ষ্টেটে জীবন ভয়ানক একঘেয়ে হয়ে যেত এবং কোন প্রকারের জ্ঞান-কর্ষণা পৃথিবীতে সম্ভবপর হত না। প্রকৃতি ও মানবতার যত প্রকার অবদান আমরা পেয়েছি, এ সবই সম্ভবপর হয়েছে বিরুদ্ধ ভাবের সংঘর্ষের ফলে। প্রত্যেক শক্তি অথবা পদার্থের একটা বিরুদ্ধ শক্তি আছে ; যেমন—জীবনের বিপক্ষ হচ্ছে মরণ, শীতের বিপক্ষ গরম, আলোর বিপক্ষ অন্ধকার, আনন্দের বিপক্ষ ব্যথা, সম্পদের বিপক্ষ দারিদ্র্য, মূলধনের বিপক্ষ শ্রমিক এবং ভাববাদ (Idealism) এর বিপক্ষ জড়বাদ (Materialism ইত্যাদি। হেগেল বলেন প্রকৃতির প্রত্যেক জিনিষের অন্তরের মধ্যেই এই বিরুদ্ধ শক্তি আছে। এই বিরুদ্ধ শক্তির নিয়ত প্রকাশ ও সংঘর্ষের ভিতর দিয়ে বহু মত ও জিনিস ক্রমান্বয় ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে বটে, কিন্তু এই নিয়ত ধ্বংস হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়ার দ্বারাই জগতে বৃহত্তর অস্তিত্বের সম্ভাবনা হয়ে থাকে। মার্কসের সিদ্ধান্ত বোঝার জন্যে হেগেলের এই কথাটাকে বোঝা একান্তই প্রয়োজন। একেই বিখ্যাত Theory of Negation বলা হয়।

এই ধ্বংসবাদের মূল কথা যে সমাজে নিয়ত দুই বিপক্ষদলের মধ্যে সংঘর্ষ চলেছে এবং এই সংঘর্ষের ফলে নানা জিনিস ধ্বংস প্রাপ্ত হচ্ছে। কিন্তু এর ফলে সৃষ্টি ও সম্ভবপর হয়েছে। এই

ধ্বংসের মধ্যেই থাকে তার বিপক্ষ সৃষ্টি-শক্তি। একে Theory of Negation of Negation বলে।

এ কথাটাকে ভাল করে বোঝবার জন্যে একটা ডিমের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্। ডিমের ভিতরে অসংখ্য জীবাণু আছে। এই জীবাণু ক্রমশঃ ডিমের ভিতরের জিনিসটা খেয়ে খেয়ে নিঃশেষ করে দেয়। এই যে ণত্ব, ইহা কিন্তু মোটেই ধ্বংস নয়, পক্ষান্তরে এই রকমেই জীবাণুটি একটি প্রাণীতে পরিণত হয়। ণত্বর কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যেতেই মুরগীর বাচ্ছাটি ডিমের খোলসটি ভেঙ্গে বেরিয়ে পড়ে। এই প্রক্রিয়াটিই হচ্ছে হেগেলের ণত্বর ণত্ব।

কার্লমার্কস্ তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ "ক্যাপিটাল"এ হেগেলের 'ডায়েলেক্‌টিক" এর সহায়তা নিয়েছেন।

সবহারা আর মূলধনওয়ালা এ দুটো হচ্ছে পরস্পর বিরোধী (antithesis), আবার এ দু'এতে মিলে একটা সম্পূর্ণ জিনিস হয়ে থাকে। জগতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অস্তিত্ব থাকায় মালদার ও সবহারা এতদুভয়ের সৃষ্টি হয়েছে। মালদার আপনার অস্তিত্ব বজায় রাখতে যেমন বাধ্য ঠিক তেমনি বাধ্য তার বিরুদ্ধ শক্তি সবহারার অস্তিত্বও বজায় রাখতে। পক্ষান্তরে সবহারারা সবহারা হওয়া হেতু আপনাদের অস্তিত্ব ধ্বংস করতে যেমন বাধ্য, ঠিক তেমনি বাধ্য বক্তিগত সম্পত্তির মালিকদের ধ্বংস করতে। কেননা, এই ব্যক্তিগত সম্পত্তির অস্তিত্ব আছে বলেই তারা সবহারা হয়েছে। এটা হচ্ছে বিরুদ্ধ শক্তির ণত্বের দিক।

মালিকরা চায় বিরুদ্ধ শক্তিটাকে বজায় রাখতে আর সবহারারা চায় সেটাকে ধ্বংস করতে। জাতীয় :এবং অর্থ নীতিক আন্দোলনের দিক থেকে বিচার করে দেখতে পাওয়া যায় যে সম্পত্তির ব্যক্তিগত অধিকার নিয়ত আপনা হতে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, কিন্তু জেনে শুনে নয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তির মধ্যে যে ধ্বংসের ক্রিয়া চলেছে সেটা সম্পত্তির মালিকের অনিচ্ছাতেই চলেছে। একটা সবহারা দলের সৃষ্টি না করে সম্পত্তির মালিক হওয়া যায় না অথচ বঞ্চিত করে মালিক হওয়াটাই হচ্ছে নিজের বিরুদ্ধে একটা ধ্বংস-শক্তির সৃষ্টি করা। মোটামুটী ভাবে মার্কস্-নীতির এই হল ভিত্তি।

দুই

১৮১৮ সালে এই যে ট্রাভে নগরে কার্ল হেনরিচ্ মার্কস জন্মগ্রহণ করেন। কার্লের পিতা ছিলেন সম্ভ্রান্ত য়িহুদী বংশীয় এবং একজন প্রতিষ্ঠাবান্ উকিল। কার্লের জননীও ছিলেন হলাণ্ডবাসী য়িহুদী রমণী।

১৮২৪ সালে কার্লের পিতা সপরিবারে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এবং প্রুশিয়ার একজন অত্যন্ত অনুরক্ত খৃষ্টান প্রজা হন। কার্লের পিতা এত বেশী রকম জার্ম্মান হয়ে পড়েছিলেন যে তিনি একবার

কার্লকে নেপোলিয়ানের পতনে ও জার্ম্মাণীর পুনরুত্থানের ব্যাপারে একটা কবিতা লিখতে বলেন। অবশ্য সে কবিতা কার্ল লেখেননি। কিন্তু কার্লের বরাবরই এই য়িহুদী জাতির প্রতি ঘৃণা ছিল।

সেইখানকার স্কুলেই কার্লের কৈশোর পাঠ শেষ হয়। এই স্কুলে পড়বার সময় কার্ল একজন উচ্চপদস্থ জার্ম্মাণের সঙ্গে পরিচিত হন। এবং প্রত্যহ তাঁর বাড়ী যান। এই জার্ম্মাণ রাজকর্ম্মচারী কার্লের শিক্ষার জন্য অনেকখানি দায়ী। মার্কস্ তাঁকে আপনার পিতার মত শ্রদ্ধা করতেন; এবং পরে এঁর বিদুষী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন।

স্কুল পরিত্যাগের পর কার্ল বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের জন্য যান এবং সেখান থেকে ১৮৩৬ সালে তিনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন।

বার্লিনে মার্কস দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্যে মনোনিবেশ করেন। আমাদের অনেকেই হয়ত জানতাম না যে কার্ল মার্কস্ তাঁর জীবনের আরম্ভে ছিলেন একজন সাহিত্যিক, একজন কবি। এই সময় দর্শনের আলোচনা তাঁর সমস্ত অন্তঃকরণ জুড়ে বসে থাকে। সারারাত দর্শনের আলোচনায় ও আত্ম-সন্দেহে ও ন্যায়-বিচারে কেটে যেত। এই তীক্ষ্ণধী যুবক জগতের সমস্ত দর্শনের মূলে কি আছে তা আপনার মন দিয়ে গ্রহণ করতে চেয়েছিল। এবং অচিরে এই মনন-শক্তির জোরেই প্রচলিত অর্থ নীতির মূল হতে আরম্ভ করে তার শেষ পর্য্যন্ত

আপনার সমস্ত অন্তর দিয়ে তলিয়ে দেখে সাম্যবাদের মন্ত্র প্রচার করেন।

সেই সময় তাঁর মনের অবস্থা কি রকম ছিল এই নিয়ে কার্ল তাঁর পিতাকে একখানি চিঠি লেখেন। "জীবনে এমন সময় আসে, যখন বেশ বোঝা যায়—যে একটা যুগ চলে গেল, আর একটা সামনে সুরু হল।...জীবনের এই সন্ধিক্ষণে মানুষের মন কাব্যময় হয়ে ওঠে। কারণ প্রত্যেক সন্ধিক্ষণের এই যে পরিবর্ত্তন এ যেন অতীতের সমাধির ওপর স্তব রচনা আর সেই একই সঙ্গে নবাগত এক নূতনের নান্দীপাঠ···আমার কাছে জীবন মনে হয় আমার এই দেহ ও মনকে নিয়ে ফুটে উঠতে চাইছে—চারিদিকে —কাব্যে, বিজ্ঞানে, দর্শনে, বাস্তব জীবনে···।

এই চিঠিতে বোঝা যায় যে সে সময় কার্ল কবিতা ও দর্শন নিয়ে ভয়ানক ব্যস্ত। কবিতা ছিল তাঁর অত্যন্ত প্রিয় সহচর।

এই সময় তাঁর জীবনে বিখ্যাত জার্ম্মাণ দার্শনিক Hegelএর ছাপ পড়ে। এবং তাঁর পরবর্ত্তী সমস্ত লেখার সঙ্গে Hegelএর গভীর সম্বন্ধ আছে। Hegel যে পদ্ধতি অনুসারে দর্শন শাস্ত্র লিখেছিলেন পরে সেই পদ্ধতিই অনুসরণ করে কার্ল তাঁর বিখ্যাত পুস্তক 'Capital' লেখেন।

১৮৩৮ সালে কার্লের পিতার মৃত্যুর পর কার্ল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের কাজের জন্য চেষ্টা করেন। এই সময়ে একটী দার্শনিক তথ্য লেখার জন্য তিনি Doctor of Philosophy উপাধি পান। কিন্তু কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরী পান নাই।

কারণ যে সমস্ত লোকের চিন্তার ধারা ছিল স্বাধীন ও নবীনতা-প্রয়াসী বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁদের স্থান হওয়া তখন দুষ্কর ছিল।

অধ্যাপকের কাজ না পাওয়ায় অবশেষে কার্ল দলভুক্ত হয়ে হেগেলপন্থীদের প্রচলিত মত খণ্ডনের জন্য সমালোচনা আরম্ভ করেন।

১৮৪২ খৃষ্টাব্দে এই দল হতে Rheinische Zeitung নামে একখানি পত্রিকা বার হয়। কার্ল এই পত্রিকায় লেখা আরম্ভ করেন। কয়েক মাস পরেই এই কাগজের তিনিই সম্পাদক হন।

এই কাগজ সম্পাদনের সময়ই তাঁর চিন্তার ধারা দর্শন ও সাহিত্যের ক্ষেত্র থেকে অর্থনীতি ও রাজনীতির দিকে অগ্রসর হয়। এই সময় ফরাসী ও জার্মাণ সাম্যবাদীদের এক মিলিত সভা হয়। সেই সভায় দেখা গেল যে, সত্যকার অর্থনীতি শিক্ষার প্রয়োজন অনুযায়ী পদ্ধতি ও গণন জার্মানীতে রাজকীয় দপ্তরের আড়ালে লুকিয়ে আছে। মার্কসের মন রাজনীতি ও অর্থনীতির দিকে অগ্রসর হল। এই নূতন বিষয় পাঠের জন্য তিনি পত্রিকার সম্পাদনের পদ ত্যাগ করেন। এবং এইখান থেকে মার্কসের নূতন জীবন আরম্ভ হয়। এই জীবনেরই পরিণত ফল—মার্কসের নূতন সাম্যবাদ বা কম্যুনিজম্ যা আজ সমস্ত জগতের চিন্তার ধারাকে বদলে দিয়েছে।

১৮৪৩ সালে মে মাসে তিনি এক পত্রে লেখেন, "এই যে শোষণনীতি ও বাণিজ্যপ্রথা মনুষ্যত্বকে শুধু দোহন করে নিচ্ছে

সংকলনের বিপুল লোভে একদিন শীঘ্রই সমাজের ভিতর থেকে এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা হবে। আর এই দুর্নীতির প্রসার প্রচলিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিরোধও করতে পারছে না, উপশমও আনতে পারছে না।"

উপরি-উক্ত চিঠিতে মার্কস্-নীতির বীজ অন্তর্নিহিত রয়েছে। এই সময় ১৮৪৩ খৃঃ অঃ মার্কস্ সস্ত্রীক প্যারিসে আসেন এবং Franco—German Year Bookএর সম্পাদক হন। এই সম্পাদন কার্য্যের সূত্রে মার্কসের সহিত মার্কসের জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু এঙ্গেলসের পরিচয় হয়। অনেকে বলেন এঙ্গেলসের সঙ্গে এই মৈত্রী-বন্ধন না হলে হয়ত মার্কসের কথা জগৎ তেমনভাবে পেত না। মার্কসের মৃত্যুর পর এঙ্গেলসই মার্কসের বিখ্যাত পুস্তক "Capital"এর প্রকাশ ও সম্পাদন ভার নেন। তার পরের কয়েক বছরের মধ্যেই কবি ও দার্শনিক মার্কস্ রাজনীতির মূল-প্রবর্ত্তনকারী মার্কস্‌রূপে পরিণত হন। এইখানে আর একজন বিখ্যাত রাজনৈতিক সাম্যবাদীর নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনিও মার্কসের মতন জগতে এক নূতন রাজনীতির তত্ত্বপ্রচারে ও তাহার প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর নাম Proudhon। তিনিই প্রথম প্রচার করেন যে Property is robbery—ব্যক্তির সঞ্চিত ধনভারের অপর নাম দস্যুতা। মার্কসের বিপ্লবপন্থার অনেকখানি অনুপ্রেরণা ছিল ফরাসী বিপ্লবের মধ্যে। সেই সময় ইংলণ্ড, জার্ম্মাণী ও ফ্রান্সে সাম্যবাদী সাহিত্যের প্রচুর প্রসার ও বৃদ্ধি লাভ ঘটে। ১৮৪২ খৃঃ

ইংলণ্ডে প্রথম সর্ব্ববৃহৎ ধর্ম্মঘটের সূচনা হয়। এই সময় বিজ্ঞান-জগতের শ্রীবৃদ্ধির ফলে চারিদিকে রেল, টেলিগ্রাফ, কল কারখানা ও ঠিক তাহাদেরি পদাঙ্ক অনুসরণ করে' সমষ্টিগত মানবের দুঃখ দারিদ্র্য বেড়ে চলে। চারিদিকে একটা অশান্ত বাণী যেন বহুস্বরে বিকৃত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। উনবিংশ শতাব্দীর মানবের এই বহুধা বিভক্ত অশান্তির মূর্ত্ত বিগ্রহ রূপেই মার্কস্ জন্মগ্রহণ করেন।

এই সময় মার্কস্ কলের মজুরদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন এবং তাদের সঙ্গে বাস করে তাদের মধ্যে প্রচার কার্য্য চালাতে থাকেন। এই রকম করে ক্রমশঃ শ্রমজীবি সঙ্ঘ মূর্ত্তি-পরিগ্রহ করে। ইউরোপের প্রত্যেক বড় বড় নগরে শ্রমজীবি-সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৮৪৭ খ্রীঃ অঃ প্রথম লণ্ডনে কম্যুনিষ্টদের কংগ্রেস বসে। সেই কংগ্রেসেই মার্কস ও এঞ্জেলস্ একটী কার্য্য পদ্ধতির বিবরণ দেন। তাহাই মার্কস্নীতির ভিত্তি। তাহার নামই বিখ্যাত **Communist Manifesto**। এই কার্য্য-পদ্ধতিতে আছে প্রথম—সামাজিক বিবর্ত্তনের ফলে সমাজের অন্যায় শ্রেণীভাগের কথা, মূলধন-ওয়ালা ও শ্রমিকের অধিকার; দ্বিতীয়তঃ—সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ এবং শ্রমজীবি-বিপ্লবের কথা; তৃতীয়—কম্যুনিষ্টদের বিপ্লব-ঘোষণা; চতুর্থ—অন্য সব সাম্যবাদী মত খণ্ডন।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মাণীতে বিদ্রোহ ঘোষণা হয়। এই সময় মার্কস্ বেলজিয়াম হতে নির্ব্বাসিত হয়ে প্যারিসে আসেন এবং

প্রচার কার্য্য সুসম্পন্ন করবার জন্য জার্মাণীতে ফিরে যান। এখানে আবার এঙ্গেলস্ ও মার্কস্ তাঁদের পুরাতন কাগজ Rheinische Zeitung বার করেন এবং মার্কসই তাঁর সম্পাদক হন। এই কাগজ চালাবার জন্য মার্কস্ সর্ব্বস্বান্ত হন। গভর্ণমেণ্টের তাড়নায় কাগজ চালান অসম্ভব হয়ে ওঠে। আপনার স্থাবর অস্থাবর যা কিছু ছিল সব বেচে ঋণ পরিশোধ করে মার্কস্ প্যারিসে আসেন। প্যারিস্ থেকে নির্ব্বাসিত হয়ে অবশেষে লণ্ডনে আসেন লণ্ডনেই তাঁর জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত হয়। লণ্ডনে অতিবাহিত অবশিষ্ট জীবন অধিকাংশই নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে কাটে। এই দারিদ্র্যে মার্কসের একটী প্রধান অবলম্বন ছিল—তাঁর স্ত্রী—সুন্দরী ও বিদুষী বারনেস্ ভন্ ওয়েষ্টফ্যালেনের অপূর্ব্ব প্রেম ও সহচর্য্য। এই সময় মার্কসের দারিদ্র্য এতদূর বেড়ে গিয়েছিল যে সত্য সত্যই তাঁকে লেখবার কাগজের জন্য আপনার সর্ব্বশেষ জামাটী বাঁধা দিতে হয়েছিল। এই অধম দারিদ্র্যের মধ্যে লক্ষপতির কন্যা সহাস্যমুখে বলেছিলেন যে মার্কসকে বিবাহ করে সুখী হয়েছি। নির্ব্বাসনে, নির্য্যাতনে, সকল সময়ে এই অপূর্ব্ব বিদুষী রমণী মার্কসের পাশে থেকে মার্কসকে নিত্য নব জীবনের অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তাঁর মুখে সর্ব্বদাই একটা স্নিগ্ধ গম্ভীর সৌন্দর্য্য খেলা করত। মার্কসের শত্রু ও মিত্র সবাই এই রমণীকে অন্তরের সঙ্গে শ্রদ্ধা করত। মার্কস ওয়েষ্ট-ফ্যালনের এই অপূর্ব্ব প্রেমে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। লেনিনেরও জীবনে এমনি একটী রমণীর প্রেম-সাহচর্য্য দারুণ দুর্য্যোগের

মধ্যে অপূর্ব্ব সহন-শক্তি এনে দিয়েছিল। মার্কস সমস্ত লেখা স্ত্রীকে প্রথম পড়িয়ে তাঁর মতামত নিয়ে ছাপাতেন।

এই লণ্ডনবাস কালেই দারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে মার্কস্ "Capital" এর প্রথম অংশ লেখেন; আমরা যেমন গীতাকে শ্রদ্ধা করি, কম্যুনিষ্টরা তেমনি "Capital"কে শ্রদ্ধা করে। জীবনের শেষ বয়সে তিনি রুষের কৃষকের সামাজিক অবস্থা জানবার জন্য রুষভাষা শেখেন। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সত্য-জ্ঞান-স্পৃহা তাঁহাকে সর্ব্বদাই জাগ্রত করে রেখেছিল। অবশেষে ১৮৮৩ খৃঃ অঃ মার্চ্চ মাসে মার্কস্ লণ্ডনে দেহত্যাগ করেন।

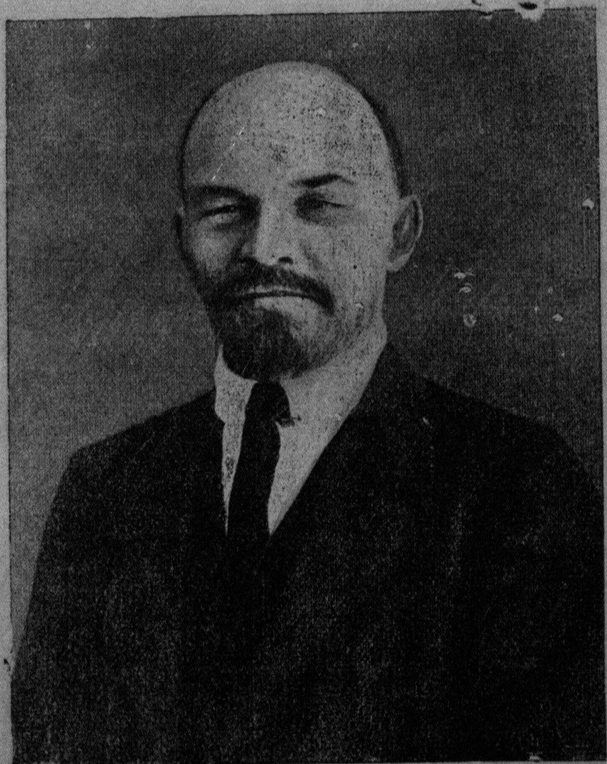
বিংশ শতাব্দীর জগতের রসায়ন-আগারে এই সমস্ত মতের পরীক্ষা চলেছে—এবং সে রসায়নাগার হচ্ছে রুষিয়া।

লেনিন ও সোভিয়েট রুষিয়া

এক

লেনিনের জীবন আজ ইতিহাস। বোলশেভিকবাদ সম্বন্ধে অনেক ভয় অনেক জাতির চলে গেছে। এমন কি অনেক জাতি লেনিনের প্রশংসা পর্য্যন্ত করে ফেলেছে।

যে লোকটা আজ সমস্ত জগতের চিন্তার ধারায় একটা নূতন বেগ ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন—সেই অসামান্য ধীশক্তি-শালী ব্যক্তিটার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে জগৎ খুব কম কথাই জানে। আজ দেশে দেশে স্বার্থের সংঘর্ষের ফলে, যে সব মহা-পুরুষগণ আপনার জীবন দিয়া ভবিষ্যৎ জগতের ইতিহাসকে সৃষ্টি করিয়া যাইতেছেন, তাহাদের জীবনের গূঢ় উৎসগুলি লোকচক্ষুর



লেনিন

অন্তরালেই থাকিয়া যাইতেছে। আজিকার মানব শুধু দেখিতে পাইতেছে তাঁহাদের বিকৃতরূপ, স্বার্থপর, রাজনৈতিকের চতুর লেখনীর মিথ্যামূর্ত্তি, কিন্তু সময়ের যবনিকার অন্তরালে সেই সমস্ত মহা-জীবন ভবিষ্যৎ জগতের মূর্ত্তি আঁকিয়া তুলিতেছে; এবং যখন এই সাময়িক দ্বন্দ্ব ও স্বার্থের সংঘর্ষ লুপ্ত হইয়া যাইবে—তখন জগৎকে প্রেরণার ও শক্তির জন্য কালের যবনিকা বার বার উত্তোলন করিয়া এই সমস্ত মহাপুরুষদের জীবনের ঘটনার দিকেই চাহিতে হইবে। হয়ত এখনকার মিথ্যা-অভিযানের ফলে তাঁহাদের জীবনের অনেক কিছু প্রয়োজনীয় ঘটনা জগৎ ভুলিয়া যাইবে—এবং জগতের ভবিষ্যৎ ইতিহাসকার ব্যর্থ ও ক্ষুব্ধ চিত্তে এই সমস্ত মিথ্যা-অভিযানের শিরে শত অভিশাপ বর্ষণ করিবে।

লেনিনকে জগতের কাছে ভয়াবহ মিথ্যায় অঙ্কিত করা হইয়াছিল এবং যে কোন স্থিরধী ব্যক্তি সেই সমস্ত মিথ্যা চিত্রগুলি যদি একত্রে দেখেন বুঝিতে পারিবেন যে প্রত্যেক মিথ্যাটী অপর কোনও মিথ্যার প্রতিবাদ এবং আসলে এ যে সব কল্পিত চিত্র তা স্পষ্ট ধরা পড়ে। কোনও কাগজে সকাল বেলা দেখা গেল যে লেনিন সাইবেরিয়াতে কোন রকমে শত্রুর গুপ্ত আঘাতের হাত হইতে বাঁচিয়া গিয়াছেন, অন্য কোনও কাগজে প্রচার হইল লেনিন মস্কোর জেলে বন্দী হইয়া আছেন। আর একটী কাগজ প্রকাশ করিল লেনিন গুপ্তচর সাজিয়া স্পেনে চলিয়া গিয়াছেন। এখনও যন্ত্র-বিজ্ঞান এত দূর সক্ষম হয় নাই যে একজন লোককে একই দিনে ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে সাইবেরিয়া হইতে মস্কোর জেল

হইয়া তাকে আবার স্পেনের মাটীতে পৌছিয়া দিবে। লেনিনের শত্রুরা লেনিনকে ভাবিয়াছিলেন সর্ব্বময়।

ঈশ্বরের যতগুলি গুণ আমরা সাধারণত দিয়া থাকি লেনিনের শত্রুগণ শত্রুতার ছলে লেনিনকে সেই সমস্ত গুণগুলি দিয়া ভূষিত করিয়াছিলেন। ভবিষ্যতে যদি কোনও লোক খবরের কাগজের খবরের উপর নির্ভর করিয়া লেনিনের জীবনী লিখিতে বসেন তাহা হইলে তিনি দেখিবেন লেনিন ঈশ্বরের মতই সর্ব্বময়, সর্ব্বশক্তিশালী, সর্ব্বজ্ঞ ও অমর।

নানা দেশে ছবি আঁকিয়া প্রচার করা হইয়াছিল—লেনিন নর-রাক্ষস, হয়ত কোনও প্রকারে আফ্রিকার গভীরতম জঙ্গল হইতে রুষিয়ায় আসিয়া পড়িয়াছে, লেলিনের অন্তর বলিয়া কোনও পদার্থ নাই। একটী ছবির একদিকে দেখান হইতেছে যে রুষবাসীরা ক্ষুধায় অস্থি-জীর্ণ দেহে মৃত কুক্কুরের মাংস ভোজন করিতে যাইতেছে—অপর দিকে তাহাদের নেতা লেনিন Kremlin এর বিরাট প্রাসাদে উচ্চসিংহাসনে আসীন—সম্মুখে শত প্রকারের ফলের ও খাদ্যের সম্ভার—এবং সমস্ত খাদ্যগুলির বিল হইয়াছে ২০০০ রুবেল।

অথচ রুষিয়ায় কোথায় কোন্ গ্রামে কোন্ কৃষক অনাহারে দিন কাটাইতেছে ভাবিয়া এই লোকটী অনাহারেই দিন কাটাইয়াছে। Kremlin এর বিরাট রাজপ্রাসাদে সামান্যতম প্রকোষ্ঠে কাষ্ঠাসনে বসিয়া লেনিন যে রাজ-ভোগ খাইতেন সমস্ত রুষবাসীর সান্ত্বনা ছিল যে, সে রাজ-ভোগ তাহারও দৈনন্দিন

থায়। আমরা গান্ধীকে দেখিয়াছি জনতাব কল্যাণের জন্য প্রায়োপবেশন করিতে—রুষিয়া লেনিনকে দেখিয়াছে নির্য্যাতিত মানবতার জন্য একজন সামান্যতম দরিদ্র শ্রমজীবির মত জীবিকা-নির্ব্বাহ কবিতে। আত্ম-শোধন ও আত্ম-ত্যাগে গান্ধী ও লেনিন সমতুল্য ও সমস্ত জগতের আদর্শ।

দুই

লেনিনের আসল নাম **Vladimir Illitch Ulianov** (ভ্লাডিমির ইলিইচ্ উলিয়ানফ্)। **Nickolai Lenin** নাম তিনি পরে গ্রহণ করেন। ১৮৭০খৃঃ অঃ ১০ই এপ্রিল রুষিয়ার গঙ্গা ভোলগা নদীর ধারে সিমবার্স্ক প্রদেশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

কেহ কেহ তাঁহাকে কৃষাণ বংশ উদ্ভূত বলেন, কেহ কেহ বলেন তিনি সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে। এ দুই-ই সত্য।

য়ুরোপের অনেকদেশে, এবং বিশেষতঃ রুষিয়ায় যে কোনও লোক সমাজের যে কোনও স্তর হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া যদি আপনার শক্তি ও প্রতিভার বলে কোনও বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন তাহা হইলে তাঁহাকে সম্ভ্রান্ত পদবাচ্য করা হয়। লেনিনের পিতা যদিও কৃষাণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি স্বীয়

প্রতিভার বলে Councillor of State হইয়াছিলেন। সুতরাং লেনিন কৃষাণবংশ উদ্ভূতও সত্য এবং সম্ভ্রান্তবংশীয় এ কথাও সত্য। লেনিনের মার নাম মেরিয়া এলেকজাণ্ড্রোভনা।

লেনিনের পিতা প্রথমে স্কুলে মাষ্টারী করিতেন। পরে আপনার প্রতিভার ও অসামান্য জ্ঞান-পিপাসার ফলে ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করেন।

লেনিনের পিতার শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চ্চার বিষয়ে একটা গভীর অনুরাগ ছিল এবং সেই জন্যই তাঁহাদের আবাসগৃহটি একরকম বিশ্ববিদ্যালয় হইয়া উঠিয়াছিল। সেখানে সর্ব্বদাই সঙ্গীত, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের চর্চ্চা পূরামাত্রায় চলিত। এই আব-হাওয়ার মধ্যে লালিতপালিত হওয়ার দরুণ লেনিনের অন্তরে একটা সরল ও গভীর সত্য জ্ঞান-স্পৃহা জন্মে যাহা ভবিষ্যৎ জীবনে বহু ভয়ঙ্কর বিপদ ও আপদের সময়ও তাঁহাকে হাসিতে সাহস দিয়াছিল।

বালককালের শিক্ষার গুণে লেনিন অত্যন্ত অল্প বয়স হইতেই জীবনের সমস্ত বিষয়ে সজাগ হইয়া উঠেন।

কৈশোর অবস্থাতেই লেনিন এবং তাঁহার ভ্রাতাগণ তাঁহাদের নিজেদের জীবনের স্বচ্ছন্দগতি ও সুন্দর পরিপূর্ণতার বাহিরে অসংখ্য লোকের নিদারুণ দুর্ব্বিসহ জীবনের দিকে চাহিয়া দেখিতে শিখিয়াছিলেন। সেখানে দেখিতেন অসম্ভব রকম অজ্ঞানতা নিত্য বাড়িয়া চলিয়াছে; তাহার উপর দিয়া জারের কঠোর শাসন তাহাদিগকে নিরুপায় ভাবে পিষিয়া চলিয়াছে। সমবেদনায় কিশোরদের হৃদয় ভরিয়া আসিত। ক্রমশঃ সমবেদনা কর্ম্মশীলতায়

জাগিয়া উঠিতে চাহে। আপনাদের স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ জীবন, এই লক্ষ ব্যক্তির বন্ধনের দিকে চাহিয়া শৃঙ্খলের মত সারা দেহে বাজে। তাহাদের যতই জ্ঞানের স্পৃহা বাড়িতে লাগিল—সমগ্র মানবকে জানিবার ও বুঝিবার স্পৃহাও তদনুরূপ বাড়িয়া চলিল। এবং তাহাদের বংশ হইতে একে একে সকলে এই নির্য্যাতিত পঙ্গু মানবের দলকে মুক্তি দিবার মহান উদ্দেশ্যে আত্ম-নিয়োগ করেন।

১৮৮৬ খৃঃ অঃ ২০শে মে একটী নিদারুণ ঘটনা গভীর ভাবে লেনিনের চরিত্রে ছাপ রাখিয়া যায়। ঐ দিবস তাঁহার ভ্রাতা আলেকজাণ্ডারকে রাজদ্রোহ অপরাধে ফাঁসি দেওয়া হয়। এই ঘটনা হইতে লেনিনের আসল জীবনের আরম্ভ ধরা যাইতে পারে। লেনিন ও তাহার ভ্রাতার মধ্যে একটা গভীর বন্ধন ছিল এবং যখন সেই বন্ধন ঐ প্রকারে ছিন্ন হয় লেনিন পরিপূর্ণ মাত্রায় সজাগ হইয়া উঠেন।

আলেকজাণ্ডার ছিলেন একজন অসামান্য প্রতিভাশালী যুবক—যাহাদের অনেককে স্বপ্ন-বিলাসী বলা হয়—সঙ্গীত ও সাহিত্য তাঁহার জীবনের অতি প্রিয় বস্তু ছিল। তিনি ও তাঁহার ভগ্নী আনা St. Petersburgএ কলেজে একসঙ্গে পড়িতে যান। সেইখানে তিনি একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মেধাবী ছাত্র হিসাবে পরিগণিত হন; এবং সেই সময় তিনি কার্ল মার্কসের লেখা নিবিষ্ট চিত্তে অধ্যয়ন করিতে থাকেন। লেনিন ও কিছুকাল পরে কার্ল মার্কসের লেখায় উদ্দীপ্ত হইয়া আপনার নূতন

জীবন আরম্ভ করেন। এই সময়ে রুষিয়ায় জারের অত্যাচার চরম সীমায় উঠিতে থাকে। বাহিরে যত অত্যাচার, অনাচার ঘটে, যুবক আলেকজাণ্ডার ততই বিদ্রোহীদের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। পরে তিনি বিদ্রোহীদের দলে যোগ দান করেন এবং পুলিশ খবর পাইয়া তাহার দলের পনেরো জনকে ধরে।

বিচারের সময় আলেকজাণ্ডার কোনও উকিলের সাহায্য গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন—এই কাজ সমস্ত আমি করিয়াছি, তাহাতে যদি দোষ হয় আমি তাহার দণ্ড গ্রহণ করিব। এই সময় লেনিনের মাতা সন্তানের মৃত্যু সংবাদে উদ্বিগ্ন হইয়া তথায় যান কিন্তু এই বীর যুবক রুষিয়ার কল্যাণের দিকে চাহিয়া মাতাকে শান্ত হইতে বলেন এবং সহাস্য মুখে তাহার কিশোর ভ্রাতাকে দেখাইয়া মৃত্যুকে বরণ করিয়া লয়।

এই ঘটনা সেই কিশোর ভ্রাতাটীর অন্তরে গভীর ভাবে আঘাত দেয়। লেনিন সেইদিন বুঝিতে পারিয়াছিলেন অন্তরের বিশ্বাস ও শক্তি কি জিনিস যাহার জন্য মৃত্যুও অতি-তুচ্ছ হইয়া যায়।

তিন

লেনিন সিমবার্স্ক বিদ্যালয়েই অধ্যয়ন করিতেন। এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন থিওডর কেরেনেস্কী। তাঁহার পুত্র কেরেনেস্কী ছিল লেনিনের সহপাঠী। এই বৃদ্ধ স্কুল-মাষ্টার কোনও দিন হয়ত' গভীরতম স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে একদিন তাঁহার পুত্র এই কেরেনেস্কী সমস্ত রুষিয়ার পরিচালক হইয়া উঠিবে এবং এই কিশোর ছাত্র একদিন তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া তাহাকে অধিকার-চ্যুত করিয়া রুষিয়াকে নবজন্ম দিবে। বাল্যে এই দুই ব্যক্তি দৈবক্রমে একই বিদ্যালয়ে একই শিক্ষকের নিকট হইতে শিক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন।

সিমবার্স্ককে অধ্যয়ন শেষ করিয়া তিনি রাজধানীর বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের জন্য যান। কিন্তু বিপ্লবীর ভ্রাতা বলিয়া সেখানে তাঁহার প্রবেশাধিকার ঘটিয়া উঠে নাই। অবশেষে তিনি কাজান বিশ্ববিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন। এই বিদ্যালয়ে বর্ত্তমান রুষিয়ার আর একজন শ্রেষ্ঠতম পুরুষ এমনি পড়িতে আসিয়াছিলেন,—তিনি মাক্সিম্ গোর্কী। দুইজনেরই এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের কাল অত্যন্ত পরিমিত।

বিদ্যালয়ে সাম্যবাদ প্রচার করা এবং ছাত্রদের বিদ্রোহে সংশ্লিষ্ট থাকার দরুণ লেনিন এই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিতাড়িত হন। বিতাড়িত হইয়া তিনি আইন-অধ্যয়ন করেন এবং পরে অতি অল্প দিনের জন্য উকিল হইয়াছিলেন এবং মাত্র একটী কেস চালাইয়াছিলেন।

১৮৯১ সালে ওকালতি পরিত্যাগ করিবার পর লেনিন নেভার ধারে শহরে শহরে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সেণ্টপিটারস্‌বার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন অধ্যয়নের সময় লেনিন কার্ল মার্কসের লেখার সহিত পরিচিত হন। মার্কসের বাণী লেনিনের অন্তরকে স্পর্শ করিল এবং লেনিন সেইদিন হইতে মার্কসকে একপ্রকার গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া লন। তখন রুষিয়ার নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে মার্কসের বাণী প্রভাব বিস্তার করিতেছিল; এবং শ্রমজীবিরা তখন সবেমাত্র আপনাদের অবস্থার শোচনীয়তা উপলব্ধি করিতেছিল। তখন লেনিন মার্কস্ পন্থার উপর একটী প্রবন্ধ লেখেন। এবং প্রবন্ধটী এত পাণ্ডিত্যপূর্ণ; সরল ও সতেজ হইয়াছিল যে রুষিয়ার সাম্যবাদ প্রচারের জনক Plekhanov সেই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, "এই যুবক একদিন জারের পক্ষে ভয়ানক বিপদজনক হইয়া উঠিবে।" পনেরো বৎসর পরে এই লেনিনই Plekhanovর হাত হইতে Social-Democratic দলের নেতৃত্বের ভারগ্রহণ করেন এবং Leninএর ব্যক্তিত্বের অন্তরালে Plekhanov অদৃশ্য হইয়া যান।

কিন্তু এই পুস্তিকা অবিলম্বে গভর্ণমেণ্ট নিষিদ্ধ বলিয়া প্রচারিত করেন। নরমপন্থী পপুলিষ্ট দলের মধ্যে তখন এই নবাগত ব্যক্তিটির বিরুদ্ধে সাবধান সাবধান রব পড়িয়া যায়। গভর্ণমেণ্টও তখন হইতে লেনিনের কার্য্যাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন।

শ্রমজীবিদের উন্নতিকল্পে তিনি এক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রমজীবিদের উন্নতির যে তীব্র বাসনা তাঁহার অন্তরে সুপ্ত ছিল তাহাকে কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভ্রাতা আলেক্জাণ্ডারের মত কিন্তু তিনি প্রথমেই বিদ্রোহীদের দলে মিশেন নাই, তিনি প্রথমত চাহিয়াছিলেন শিক্ষা দিয়া শ্রমজীবিদের অজ্ঞান অবস্থার উন্নতি করিতে তাহাদের—বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে একটা জ্ঞান সংযোগ করিয়া তাহাদিগকে আপনা হইতে বুঝিতে দেওয়া তাহারা কি ভয়ানক দুরবস্থায় রহিয়াছে। কিন্তু জারের শাসনে সে বিদ্রোহী হউক বা কোন রকমে লোকের অজ্ঞতার গতি অন্য দিকে প্রবর্ত্তনকারী শান্ত-ব্যক্তিই হউক—সে সাম্রাজ্যের শত্রু। তাই ১৮৯৭ খৃঃ অঃ ২৯ জানুয়ারী রাজ-আজ্ঞায় দণ্ডিত হইয়া লেনিন পূর্ব্ব সাইবেরিয়াতে নির্ব্বাসিত হন।

লেনিন সাইবেরিয়াতে একা যান নাই। তখন শত সহস্র রুষ যুবক মৃত্যুহীন অচপল অন্তঃকরণে দীর্ঘ অনাচার ক্লান্ত এই সাইবেরিয়া পথ বাহিয়া নির্ব্বাসনে চলিয়াছিল; সাইবেরিয়ার এই বন্দীশালা রুষিয়ায় মুক্তির প্রেরণা আনিয়াছিল এবং এই সাইবেরিয়ার জনহীন নিষ্করুণ প্রকৃতির মধ্যে দেশমাতার সুসন্তান-রুষিয়ার সত্যকারের জীবনকে মর্ম্মে মর্ম্মে দেখিতে পাইতেন—

তাই বন্দীশালা পরোক্ষভাবে তাঁহাদের অন্তরে মুক্তির কামনাকে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিয়াছিল।

সাইবেরিয়ার এই নির্ব্বাসনে লেনিন ক্ষুব্ধ হন নাই। স্থির-ভাবে চিন্তা করিবার ও অধ্যয়ন করিবার এই তো উপযুক্ত অবসর। তাই সেই নির্ব্বাসনে তিনি গভীর অধ্যয়ন ও চিন্তায় ব্যাপৃত হন। **Suspenskoy** গ্রামে বসিয়া তিনি প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন, এই সময় তিনি **"Ilyich" "Ilin" "Tylin" "Lenin"** নাম ব্যবহার করেন।

নির্ব্বাসন শেষ হইলে পর রুষ গভর্ণমেণ্ট হইতে তাঁহাকে আদেশ করা হয় যে তিনি আর রুষিয়ার কোন বড় শহরে, কিম্বা যেখানে কলকারখানা আছে বা যেখানে বিশ্ববিদ্যালয় আছে এমন স্থানে বাস করিতে পারিবেন না। এই সময় লেনিন য়োরোপ পরিভ্রমণে বহির্গত হন এবং **Iskra** স্ফুলিঙ্গ নামে একখানি সাম্যবাদী কাগজ প্রকাশ করেন। স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত সমস্ত রুষ সাম্যবাদী তাঁহার দলে আসিয়া জুটিতে লাগিল।

এই নির্ব্বাসিতদের দলের মধ্যে থাকিয়া এবং তাহাদের পরি-চালনার ভার লইয়া লেনিন তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের অসামান্য কর্ম্মপ্রতিভা ও পরিচালনক্ষমতা আয়ত্ত করিতেছিলেন। এই কাগজে শ্রমজীবিদের সত্যকারের অভাব অভিযোগ ও অবস্থার বিশদ বিবরণ সংগ্রহ করা এবং শ্রমজীবি-সঙ্ঘ প্রচার করা উদ্দেশ্য ছিল। অনেক তরুণ যুবক লেনিনের সহিত যোগদান করেন

এবং এই সমস্ত যুবকের সাহায্যে লেনিন রুষিয়ার অভ্যন্তরে আপনার মত প্রচার করাইতে লাগিলেন।

এই সময় লেনিনের পশ্চাতে পুলিশের লোক তাঁহার গন্ধ শুঁকিয়া অনবরত তাঁহার পিছু লইয়া তাঁহাকে উত্ত্যক্ত করিতেছিল। কিন্তু তিনি অনবরত পুলিশের হাত এড়াইয়া মিউনিচ, পারিস, লণ্ডন, জেনেভা প্রভৃতি য়ুরোপের প্রধান প্রধান নগরগুলি বিশেষ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসেন।

এই সময় একটী নারী সর্ব্বান্তঃকরণ দিয়া লেনিনের এই আদর্শকে ফুটাইয়া তুলিতে সাহায্য করেন। সে নারী লেনিনের স্ত্রী **Nadezhda Krupskaya.** লেনিনের সমস্ত বিপদ ও আপদের সঙ্গে এই নারী আপনার প্রেম-গভীর শক্তি সামর্থ্য জড়াইয়া দিয়া লেনিনের কার্য্যকে অনেকখানি সুগম করিয়া তুলিয়াছিলেন। তিনিই ছিলেন এই নির্ব্বাসিত রুষ-সাম্যবাদী দলের সেক্রেটারী। গভীর রাত্রে একাকী তিনি কাজ করিতেন—যে সমস্ত গুপ্ত পত্র গুপ্ত হরফে আসিত—তিনি তাহার পাঠোদ্ধার করিতেন। এই সমস্ত পত্র অদৃশ্য কালী দিয়া লেখা থাকিত।

রুষ-বিপ্লবিদের প্রধানতঃ ও প্রথমতঃ দুটী বিভিন্ন দল ছিল। একদলের নাম ছিল **Social Democrats,** আর এক দল ছিল **Social Revolutionists.** শেষোক্ত দলের লোকদেরই টেরারিষ্ট (**Terrorists**) বলা হয়। তাহারা যুদ্ধ-বিপ্লবে আগা-গোড়া হইতে বিশ্বাস করিত এবং সেই ভাবেই কাজ করিয়া চলিয়াছিল। এই দলের লোকেরা সুবিধা পাইলেই গোপনে হত্যা করিত।

লেনিন Social Democrats দলের প্রধান নেতা ছিলেন। ইহারা গোপনে শ্রমজীবিদের শিক্ষা ও বিপ্লব-বাণীর দ্বারা অনুপ্রাণিত করিয়া একটা বৃহৎ জন-বিপ্লবের অয়োজন করিতেছিলেন। এই আয়োজনের ফলে রুষিয়ার ১৯০৫ সালে স্থানে স্থানে জন-বিপ্লব হয় কিন্তু অবশেষে মাস্কোতে এই বিপ্লবীরা পরাস্ত হয়। তাহার ফলে এই দলের বহুলোক নিহত ও নির্ব্বাসিত হন। গোর্কী ও জিনোভিভ্ এই বিপ্লবে কোনও রকমে মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচিয়া যান।

সেই সময় Social Democrats দল বাদানুবাদের ফলে দুই ভাবে বিভক্ত হইয়া পড়ে। বোলশেভিস্‌ম ভয়ানক কথাটী এই সময়েই জন্মগ্রহণ করে। যে দলের লোকেদের সংখ্যা বেশী হইল তাহাদের নাম হইল বোলশেভিক; কারণ রুষ ভাষায় bolse কথার মানে বেশী। আর যাহাদের দলে লোক সংখ্যা কম রহিল তাঁহারা হইলেন menshevists—মেনশেভিষ্টস্ (manshe মানে অল্প); বোলশেভিকগণ কম্যুনিষ্টবাদের চরমপন্থা অবলম্বন করিতে চান; অন্যদল চায় আপোষ করিতে। কিছুকাল লেনিনকে শুধু এই মেনশেভিষ্টদের বিরুদ্ধেই ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছিল।

এই সময় তিনি গোপনে নির্ব্বাসিত অবস্থায় য়ুরোপের নগরে নগরে ঘুরিয়া বেড়াইয়া বাহির হইতে রুষিয়ার বিপ্লবের আয়োজন চালাইতেছিলেন। প্যারিসের বিখ্যাত গ্রন্থালয়ে Nationale Bibliothequeএ এবং লণ্ডনের বৃটীশ মিউসিয়ামে এই নির্ব্বাসিত রুষ তখন দিনের পর দিন গ্রন্থের পর গ্রন্থ অধ্যয়ন

করিয়া চলিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের ও ফ্রান্সের গ্রন্থগারগুলিই লেনিনের শিক্ষার সামগ্রী জোগায়।

চার

বিজ্ঞানের চর্চ্চা ও নব-নব আবিষ্কারের ফলে বিগত উনবিংশ শতাব্দীতে য়ুরোপে ভীষণ পরিবর্ত্তন ঘটিতে থাকে। প্রত্যেক জাতিকে সময়ের স্বধর্ম্ম-অনুযায়ী আপনাদের মধ্যে অদল-বদল করিতে হইয়াছিল। কিন্তু বিপুল রুষিয়া সে উঠা-পড়ায় সাড়া দেয় নাই।

য়ুরোপে যখন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত, রুষিয়ায় তখন রাজাকে তাহারা সত্য সত্যই দেবতা ভাবিত। সাধারণ রুষের অন্তরে পশ্চিমের শিক্ষা-দীক্ষা অপেক্ষা প্রাচ্যের বৈশিষ্ট্য প্রচুর পরিমাণে ছিল ও আছে। বোলশেভিক-বিপ্লবের সময় যখন জারের বংশধরদিগকে হত্যা করা হয় তখন সেই খবর রুষিয়ার সাধারণ লোক বিশ্বাস করিতে পারে নাই। যদিও জারের দ্বারা তাহারা অসংখ্য রকমে নির্যাতিত হইয়াছিল তথাপি তাঁহাদের অন্তরে জার এই নামটীর সঙ্গে একটা রহস্যময় ধর্ম্মভাব জড়াইয়াছিল। তাই অনেক কৃষাণ খবর শুনিয়া বলিয়াছিল, জার নিশ্চয়ই কোথাও

গুপ্তভাবে আছে—আবার একদিন ফিরিয়া আসিবে। অবশ্য এ ভাব শীঘ্রই তিরোহিত হয়।

১৯০৫ সালে রুষিয়ায় যে জন-বিপ্লব হয় তার ফলে কিছু কালের জন্য জারের রাজত্ব একটু বেসামাল বোধ হইয়াছিল বটে কিন্তু ১৯০৭ সালে স্যার এডওয়ার্ড গ্রের মধ্যবর্ত্তিতায় রুষিয়ার জার ইংলণ্ডের নিকট হইতে বহুপরিমাণে অর্থ ঋণ স্বরূপ পান। এবং এই সময়েই ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রুষিয়ার মধ্যে Triple Entente অর্থাৎ আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯১৪ সালে য়ুরোপের রণাঙ্গণে ক্ষুধিত পশুর চিৎকারধ্বনি বাজিয়া ওঠে।

মোলায়েম মৈত্রীর কথার বন্ধন ভাঙিবার যখন প্রয়োজন হইল তখন য়ুরোপের সমস্ত জাতি সর্ত্ত, চুক্তি সন্ধি সব পুড়াইয়া মহাযুদ্ধে নামিয়া পড়িল।

তখন লেনিন সুইজারল্যাণ্ডে নির্ব্বাসিত। সেইখান থেকেই তিনি শ্রমজীবিদের মধ্যে প্রচার করিতে লাগিলেন যে এই যুদ্ধে কোনও রকমে সাহায্য করা মহা-অন্যায়,—এ অভিজাত সম্প্রদায়ের অধিক উষ্মাজনিত রক্ত-বিলাস।

জারের রুষিয়া এই যুদ্ধে জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যোগদান করে। এই যুদ্ধে যোগ দেওয়ার ফলে রুষিয়ার বিপ্লবের পথ অনেকখানি সোজা হইয়া আসে। যুদ্ধের ফলে বাইরের আমদানী প্রায় এক রকম বন্ধ হইয়া যায়; ১৯১৫ সাল নাগাদ রুষিয়ার যুদ্ধের রসদ এক রকম প্রায় বন্ধ হইয়া যায়; সৈন্যদের অনাহারে যুদ্ধ করিতে

হইয়াছে ; এমন কি কামান বন্দুকও সকলের জোটে নাই ; এমনি করিয়া সমস্ত সৈন্যের মধ্যে নিদারুণ অসন্তোষ প্রবেশ করে। এরি মধ্যে যুদ্ধের সময় বড় বড় ব্যবসাদারেরা রীতিমত অর্থশোষণ করিতে থাকেন। এই যুদ্ধ তাঁহাদের ব্যবসার বিষম সুবিধা করিয়া দেয় ; এবং তাঁহারা সে সুবিধা পূরোমাত্রায় গ্রহণ করেন।

এই সমস্ত ব্যবসাদারমিলে রাসপুটিন নামে একজন মহাভণ্ড ধর্ম্মযাজককে হাতে রাখে। এই রাসপুটিন ধর্ম্মের নামে ব্যাভিচারের রাজত্ব পূরোদমে চালাইয়াছিল। রাসপুটিনই ছিল এক রকম জারের রাজত্বের শাসক ; রাণীর উপর তার বিশেষ আধিপত্য ছিল। ১৯১৭ সালে ২৯ ডিসেম্বর এই রাসপুটীনকে পেট্রোগার্ডে এক ভোজে হত্যা করা হয়। ১৯১৭ সালে মার্চ্চ মাসে পেট্রোগার্ড (বর্ত্তমান লেনিনগার্ড) সহরে শ্রম-জীবিরা প্রকাশ্য বিপ্লব ঘোষণা করে। যে সমস্ত সৈন্যদের বিপ্লব দমনের জন্য পাঠান হয় তাহারাও অবশেষে বিপ্লবীদের সহিত যোগদান করে। মার্চ্চ মাসের এই বিপ্লবের ফলেই রুষিয়ার ধ্বংসোন্মুখ জারের একাধিপত্যের শেষ হইয়া সোভিয়েট রুষিয়ায় নবজন্ম লাভ হয়।

কম্যুনিষ্টগণ জয়ী হইয়া প্রথমত সর্ব্বরকমে চেষ্টা করিয়াছিলেন **Dictatorship of the Working Classes** শ্রমজীবিদের শাসনমণ্ডলীর প্রতিষ্ঠা করিতে এবং ধনিক-তন্ত্রের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধন করিত। এই কার্য্যে তাঁহারা যে পন্থা অনুসরণ করেন মোটামুটী তাহা এই ;—

(১) সমস্ত রকম জমির উপর কোনও ব্যক্তিগত দাবী থাকিবে না।

(২) ব্যক্তিগত ব্যবসা তিরোহিত হইবে।

(৩) জমির ধনাগমের সমস্ত বিষয়—যথা খনি, কারখানা, রেল, ইত্যাদি সমস্ত ষ্টেটের অধীন হইবে ; এবং এই সমস্ত বিষয় যতদূর সম্ভব শ্রমিক-সঙ্ঘ দ্বারাই পরিচালিত হইবে।

(৪) প্রচলিত নিয়ম কানুন, আইন আদালতের পরিবর্ত্তে "People's Court" পঞ্চায়েতের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এবং এই পঞ্চায়েতের সভ্য শ্রমিকদের দ্বারাই নির্ব্বাচিত হইবেন। অবশ্য শ্রমিক অর্থে শুধু দৈহিক পরিশ্রমকারীদের কথা বলা হইতেছে না।

(৫) কার্য্যকরী ক্ষমতা শ্রমিকদের হাতে থাকিবে—; বুর্জ্জোয়াদের ভোটের কোনও অধিকার থাকিবে না; শ্রমিকদের হাতেই সামরিক শক্তি থাকিবে।

(৬) কার্য্যক্ষম প্রত্যেক নরনারীকে শ্রম করিতেই হইবে এবং ষ্টেট প্রত্যেক নরনারীর সুখ সুবিধার জন্য দায়ী।

কিন্তু কম্যুনিজমের নিয়মকানুন, আইনসভা যাঁহারা করিয়াছিলেন তাঁহারা কেহই শ্রমিকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নন। তাঁহারা প্রত্যেকেই professional class এর অন্তর্ভুক্ত। তাঁহাদের জীবনের অভিজ্ঞতা শ্রমিকদের অন্তরকে পূরা মাত্রায় আপনার করিয়া লইয়াছিল।

এই সমস্ত লোকেদের মধ্যে প্রথমেই লেনিনের নাম আসে।

কম্যুনিষ্টরা যদিও বীরপূজা মানে না তথাপি আজ লেনিন কম্যুনিষ্টগণের মধ্যে যে শ্রদ্ধা ও পূজার স্থান অধিকার করিয়া আছেন তাহার গভীরতা ও ব্যাপকতা অনমুমেয়। কার্ল মার্কস্ এবং লেনিন আজ সমস্ত জগতের সাম্যবাদীদের সমান শ্রদ্ধার পাত্র।

লেনিনের চরিত্র এই শ্রদ্ধা আপনি আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছে। লেনিনের তীক্ষ্ণ মনীষা ও ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি তাঁহার সহযোগী সমস্ত নেতাদের স্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছিল। লেনিন নূতন রুষিয়ার নব নব বিপদের সময় আপনার অসাধারণ ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির সাহায্যে সেই বিষম শতধা-বিক্ষিপ্ত সমাজকে নির্বিঘ্নে পরিচালিত করিয়া চলিয়াছিলেন। এবং এই ভবিষ্যত দৃষ্টি, সে তাঁহার প্রভূত শিক্ষার অর্জ্জিত সম্পত্তি, কোনও অলৌকিক শক্তির ক্রিয়া নয়। বহুবার তাঁহার অন্যান্য সহকর্ম্মীদের সহিত বিষম দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছিল কিন্তু প্রায়ই দেখা যাইত লেনিনের কথাই অবশেষে সঠিক হয়।

নভেম্বর বিপ্লবের পূর্ব্বে জেনোভিভ্ এবং কেমেনফ্ দুইজনেই বিপ্লবের বিষয়ে বিশেষ হতাশ হইয়া বলেন যে, এ সময় বিপ্লব ঘটাইলে পরাজয় নিশ্চয়। লেনিন বলেন, পরাজয় অসম্ভব। জয়ী হইয়া নূতন নূতন ভয়াবহ বিপদের সম্মুখে অধিকাংশ বোলশেভিক নেতা হতাশ হইয়াছিলেন। লেনিন একা বলেন, **Every day will bring us new strength**—প্রতিদিনই আমরা নূতন বল পাব। বহু শত্রুর বিরুদ্ধে অসম্ভব গোলমালের মধ্যে সোভিয়েট রুষিয়া পুরা-মাত্রায় সুপ্রতিষ্ঠ হয়।

জার্ম্মাণীর সহিত সন্ধি বিষয়ে ট্রট্স্কী ডিপ্লোমাসীর সাহায্যে সন্ধিকে ওড়াইয়া চলিতেছিলেন। লেনিন বলেন, সন্ধি করা এখন একান্ত প্রয়োজন। সন্ধির প্রস্তাব যতই খারাপ হ'ক এখনই তাহা গ্রহণ করা হ'ক; তা না হইলে শীঘ্রই আমাদের এর চেয়ে বেশী খারাপ প্রস্তাবে সন্ধি করিতে বাধ্য হইতে হইবে। এবং সত্য সত্যই সোভিয়েট রুষিয়াকে শীঘ্রই পরাজিত অবস্থায় Brest-Litovskএ জার্ম্মাণীর হিতকর প্রস্তাবে সই করিতে হইয়াছিল। Brest-Litovskএর সন্ধির বিষয় পরে বলিব।

এখানে লেনিনের বিষয় কিছুক্ষণের জন্য ছাড়িয়া দিয়ে অন্য নেতাদের ঈষৎ পরিচয় দিব।

লেনিনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সহ-কর্ম্মী ট্রট্স্কী। রুষিয়ার বিখ্যাত Red Armyর প্রতিষ্ঠাতা এই অদ্ভুদকর্ম্মা মনীষি বোলশে-ভিক-অভ্যুত্থানের মেরুদণ্ড। সমান্য কৃষক ও যুদ্ধ-বিদ্যায় সম্পূর্ণ অশিক্ষিত শ্রমিকদের মাত্র এই কয়েক বৎসরের শিক্ষায় ট্রট্স্কীএমন এক সুশিক্ষিত সৈন্যমণ্ডলীর সৃষ্টি করিয়াছেন, যা বহুবার য়ুরো-পের মিলিত শক্তিকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। লেনিন ও ট্রট্স্কী দুইজন বহু বিষয়ে অনেক ভিন্ন তবুও তাঁহারা কম্যুনিজম্এর দুইটী বিশাল ভিত্তি। অনেকেরই ধারণা যে লেনিন ও ট্রটস্কীর মধ্যে কোনও হীন ঈর্ষার সম্বন্ধ আছে; কিন্তু সে সম্পূর্ণ মিথ্যা। বহুবার এই দুইজনের মধ্যে বিষম মতদ্বৈধ হইয়াছে কিন্তু সে শুধু আপনাদের উদ্দেশ্যের উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই; ব্যক্তির স্বার্থের অপেক্ষা সমষ্টীর বা যে সাধনার জন্য তাঁহারা নামিয়াছিলেন

তাহার কল্যাণই তাঁহাদের মনকে ঘিরিয়া রাখিয়াছিল; তাই প্রবল মতদ্বৈধ থাকিলেও লেনিন লেনিনই ছিলেন—ট্রট্স্কী ট্রট্স্কীই আছেন। এ বিষয়ে আমাদের দেশের নেতাগণের যে হীন মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায় তাহা স্বদেশ-প্রীতির ঠিক উল্টা জিনিষ।

ট্রট্স্কী একজন বিখ্যাত বক্তা ও সাহিত্যিক। কেমন করিয়া ক্ষুধিত জনতাকে উন্মত্ততায় প্রাণোদিত করিতে হয় ট্রট্স্কী তাহা ভাল রকমই জানেন। অনেকে বলেন বর্ত্তমান জগতের মধ্যে ট্রট্স্কী অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বক্তা। ট্রট্স্কী বর্ত্তমান রুষিয়ার রাজনীতি, সমাজনীতি ও সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক বই লিখিয়াছেন। বর্ত্তমান রুষ সাহিত্য বুঝিতে হইলে ট্রট্স্কীর Literature and Revolution নামক অপূর্ব্ব পুস্তক পড়িতেই হইবে।

চিচেরিণ (Chechering) বোলশেভিক রুষিয়ার Foreign Minister. বহুবার য়ুরোপ এই পাকা ডিপ্লোমাটের হাতে ঠকিয়াছে। চিচেরিণ য়োরোপের একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ডিপ্লোমাট। জারের চাকরী পরিত্যাগ করিয়া চিচেরিণ স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যকে বরণ করিয়া লন এবং বোলশেভিকদের সহিত যোগদান করেন। এই বিষম শক্তিশালী রাজনৈতিক অন্তরে একান্ত উদার। প্রত্যেক প্রহরীর বাড়ীর সমস্ত খবর চিচেরিণের বেশ জানা আছে। একবার একদিন সকাল বেলায় ঝাড়ুদার ঘর পরিষ্কার করিতে আসিয়া দেখে চিচেরিণ বাইরে এক গাছের তলায় শুইয়া আছেন——ঘরে কয়েক জন অর্দ্ধনগ্ন ভিখারী ঘুমাইতেছে।

বার্ট্রাণ্ড রাসেলের কথায় বলিতে গেলে, "প্রকৃত সমাজতন্ত্র—আন্তর্জ্জাতিক। লেনিন কেবলমাত্র রুষিয়ার হিতের জন্য বিপ্লবে যোগ দেন নাই—সমগ্র জগতের হিতের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই তিনি আন্দোলন চালাইতেছেন……রুষ সমাজতন্ত্রীদের ইহাই বদ্ধমূল ধারণা।"

১৯১৮ সালে জুলাই মাসে জার এবং তাঁর বংশকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। ওয়েলস্ বলেন—"এই হত্যার জন্য বোলশেভিক শাসন মণ্ডলীকে দোষদেবার মত কোন প্রমাণ নেই। ১৯১৯ সালের জানুয়ারী মাসে চার জন গ্রাণ্ডডিউক—জারের পিতৃব্যগণকে লেনিনের তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও পুলিশ কমিশনার ফাঁশি দেন।"

১৯২১ সালের কাছাকাছি জগতের অনেক জাতির বোলশেভিক ভীতি ক্রমে ক্রমে বাহ্যত কমিয়া আসিতে থাকে। কিন্তু সেই বছরে রুষিয়ায় যে ভয়ানক দৈবদুর্ব্বিপাক ঘটে তাহার মধ্যে দিয়ে বোলশেভিকবাদ যে বাঁচিয়া উঠিয়াছে—তাহাতে জগতে এই প্রমাণ হইয়াছে যে তাহাদের নেতাদের ক্ষমতা ও মস্তিষ্ক-বল আছে। ১৯২১ সালে অকস্মাৎ রুশিয়াতে ভয়ানক অনাবৃষ্টি ঘটে; এবং তাহার ফলে শস্য একদম জন্মায় নাই। মানবের ইতিহাসে এত বড় দুর্ভিক্ষ খুব কম দেখা গিয়াছে। লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করে। অসংখ্য জনসঙ্ঘ, সমস্ত গ্রাম, নগর রুদ্ধদ্বারে মৃত্যুর অপেক্ষায় স্থির হইয়া থাকিয়া অবশেষে মৃত্যুকে বরণ করিয়া নেয়। জনশূণ্য প্রান্তর শুধু অসংখ্য মৃতের স্তুপ নিয়ে মূক হয়ে পড়ে থাকে। কিন্তু কয়েক শত মাইল দূরে,

কয়েক দিনের পথের শেষে, ইংলণ্ডে, আমেরিকায়, হাঙ্গারী ও রুমানীয়াতে শস্য সব উদ্বৃত্ত হয়ে পড়েছিল, সেখানে ব্যবসায়ীদের সঞ্চয়াগারে লভ্যাংশ বেশী পরিমাণে ফিরে আসছিল—আর এ ধারে লক্ষ লক্ষ মানব এক মুষ্টি অন্নের জন্য মানবের মৃত দেহ খেয়েছিল। ওয়েলস বলেন,—"যে-বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট একদিন এই ভূতপূর্ব্ব মিত্রের জন্য অন্যায় যুদ্ধের খরচ স্বরূপ লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হয়নি সেই বৃটেন আজ এই সময়ে একটী অন্ন দিয়াও সাহায্য না করিয়া আপনাদের নাম সমস্ত জগতের কাছে কলঙ্কিত করে।" এই সময় উত্তর-মেরুর আবিষ্কর্ত্তা বিখ্যাত ডাঃ নান্‌সেন একটী সাহায্য-সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বহুলোক এই সাহার্য্য-সমিতিতে যোগদান করেন। মহা-প্রাণ আনাতোল ফ্রাঁস তাঁহার নোবেল প্রাইজ লব্ধ সমস্ত অর্থ এই দুর্ভিক্ষে দান করেন।

কিন্তু বোলশেভিকবাদ ইহার মধ্য দিয়াও বাঁচিয়া রহিল। অবশেষে ১৯২২ সালে জেনোয়াতে ইউরোপের আর্থিক উন্নতির পন্থা নির্দ্ধারণের জন্য সে সর্ব্বজাতীয় সভা বসে তাহাতে বোল-শেভিক প্রতিনিধিরও স্থান হইয়াছিল।

লেনিন সদাপ্রফুল্ল, নিতান্ত দৃঢ়চেতা পুরুষ এবং মানব চরিত্রে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। জনশক্তির উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল। অনেকে জানেন তিনি সাহিত্য ও সঙ্গীতের শত্রু কিন্তু আসলে ঠিক তা নয়। আপনার আদর্শের জন্য তিনি স্থির অবিচলিত চিত্তে যে অসম্ভব রকম নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছেন বর্ত্তমান যুগে

তাহা বিরল। জীবনের এই দুঃখ কষ্ট তাঁহার মতে জাতির বিকাশের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন। তাঁহার বক্তৃতা তেজপূর্ণ, সুন্দর কিন্তু সাহিত্য রসহীন কখনও কখনও গোপন শ্লেষাত্মক। প্রাচীন বৌদ্ধ ভিক্ষু যেমন করিয়া আপনাকে সঙ্ঘের নিকট দান করিত লেনিন তেমনি আপনার জীবনের সমস্ত সুখ-দুঃখ আপনার আদর্শের সম্মুখে ধরিয়া দিয়াছিলেন। লণ্ডনের Herald পত্রিকার সম্পাদক তাঁহার সহিত সাক্ষাতের পর যে অভিমত প্রকাশ করেন তাহাতে আছে—"Kremlin এর বিরাট প্রাসাদগুলির একটা সাধারণ গৃহে লেনিনের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। কোনও ভৃত্যদ্বারা আমার আগমন সংবাদ বিজ্ঞাপিত হয় নাই। প্রাসাদের বহির্দ্বারগুলি সশস্ত্র প্রহরী পরিরক্ষিত বটে, কিন্তু তাঁহার বাসগৃহগুলি সম্পূর্ণ অরক্ষিত। প্রাসাদের কোন স্থলেই আড়ম্বরের কোন চিহ্ন দেখিলাম না।……আমার সহিত যেদিন তাঁহার সাক্ষাৎ হইল সেদিন তিনি সবেমাত্র অসুখ হইতে উঠিয়াছিলেন, কিন্তু তবুও তাঁহার স্বাভাবিক প্রফুল্লতা ও জলন্ত উৎসাহ পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান। এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার কথা-বার্ত্তায় কোনও দুর্ব্বলতার লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই, কঠিন ও অপ্রীতিকর প্রশ্নগুলির খুব স্পষ্ট ও সত্য উত্তর দিতে তাঁহাকে একটুও ভাবিতে হয় না। এরূপ স্থলে অন্য দেশের মন্ত্রীসভার যে কোনও মন্ত্রী হয়ত তাঁহাদের নানাপ্রকার অসুবিধা উল্লেখ করিতেন এবং পাছে প্রশ্নের ভুল জবাব দিয়া বসেন এই ভয়ে একদল কর্ম্মচারীকে হাতের কাছে রাখিতেন। কিন্তু লেনিন একাকী

সমস্তই করেন। কারণ তিনি রাজনৈতিক চাল জানেন না। যেরূপ ভাবে তিনি মন্ত্রীসভায় যান ঠিক সেইরূপ ধীরতার সহিত ফাঁসি কাঠে ঝুলিতে পারা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব নয়। তিনি যে রুষিয়ার যথেচ্ছাচারী প্রভু তাহা নহে। রুশিয়ার সর্ব্ববিধ প্রেরণা তাঁহার নিকট হইতে আসে।”

লেনিনের মৃত্যুর পর জগতের সমস্ত অংশ হইতে এই মহা-পুরুষকে স্বীকার করা হইয়াছিল। একদিন পিটার রুষিয়াকে নবজন্ম দেন এবং তাঁহার নামে রুষের রাজধানীর নাম পেট্রোগার্ড রাখা হয়। লেনিনের মৃত্যুর পর রুশিয়া তাহার নব মুক্তিদাতার নামে রাজধানীর নাম বদলাইয়া লেনিনগার্ড রাখিল।

বিখ্যাত দার্শনিক বার্ট্রাণ্ড রাসেল তাঁর বিখ্যাত পুস্তকে লেনিনের যে ছবি দিয়াছেন তাহাতে লেনিনের চরিত্রের অনেক দিক বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠে। “লেনিনের ঘরখানি অতি সাধারণ, একবারে বাহুল্য-বর্জ্জিত। ঘরখানিতে বড় বড় তুইটী লিখিবার ডেস্ক, চতুঃপার্শ্বের দেওয়ালে ম্যাপ টাঙ্গান, তুইটী বইয়ের আলমারী এবং দর্শকের জন্য একখানি আরাম কেদারা, তা ছাড়া আস্ত কাঠের তুইখানি চেয়ার। বিলাসের স্পৃহা তো দূরের কথা, তাঁহার নিজের সুবিধার দিকে পর্য্যন্ত দৃক্‌পাত নাই। তিনি অতি সরল প্রকৃতির, বন্ধুবৎসল ও মিষ্টভাষী, তিনি কে বলিয়া না দিলে তাঁহাকে চিনিবার জো নাই। আমার জীবনে আত্মম্ভরিতা বর্জ্জিত এরূপ লোক তুটী আর দেখি নাই। তিনি মুখোমুখী হইয়া একচোখ বন্ধ করিয়া দর্শকের সহিত আলাপ করেন;

তাহাতে অন্য চোখের অন্তর্দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা অসম্ভব রকম বাড়িয়া যায়। তিনি খুব উচ্চ হাস্য করেন, প্রথমে এই হাসি বন্ধুর হাসি বলিয়া মনে হয় কিন্তু কিছুকাল পরে এই হাসির প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয়। তাঁহার হাসি অতি ভয়ানক! কঠোর বাস্তব সত্য উপলব্ধি করিলে মিথ্যা অনাচারের প্রতি যে অবজ্ঞা আসে, ইহা সেই অবজ্ঞার হাসি। তিনি তাঁহার হৃদ্‌পিণ্ড দিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে যেন জগতের যত অত্যাচার অনাচার উপলব্ধি করিয়াছেন। ...আমার মতে তিনি আনন্দবাদী ও অত্যন্ত গোঁড়া সমাজতন্ত্রী।"

লেনিন বিপ্লবধর্ম্মী। কিন্তু লেনিনের এই বিপ্লবকে অনেকে ভুল বোঝেন। অনেকের ধারণা লেনিন রক্তপিপাসু তৈমুরের মত হিংস্র ও রক্তলোভী। অন্ততঃ এই রকমভাবে লেনিনকে প্রচার করা হইয়াছিল। ১৯২১ সালে লেনিন যখন রুষিয়াকে নিরুপদ্রব পন্থায় গড়িয়া তুলবার পথ ধরেন তখন তাঁহার দলের অনেকেই তাঁহার বিরুদ্ধে গিয়াছিল। তখন তিনি আপনার কার্য্যপ্রণালী বোঝাইবার জন্য একটী প্রবন্ধ লেখেন। তিনি বলেন "অনেক বিপ্লবী বিপ্লব ও সংস্কারের সীমানা কোথায় জানেন না। সত্যিকারের বিপ্লবীদের আসল বিপদই হচ্ছে যে তারা জানে না বিপ্লব কতটুকু করা উচিত, কোথায় থামা উচিত এবং কখন থামা উচিত। অধিকাংশ বিদ্রোহীই বিদ্রোহের নামেই এমন উন্মত্ত হয়ে উঠে যে তারা অন্যায়ভাবে বিদ্রোহকে স্বর্গে তুলে ধরে। এতে করে তারা সত্যকার বুদ্ধি হারায় এবং কখন বিপ্লব বন্ধ করে সংস্কার আরম্ভ করতে হবে তা ভুলে যায়।

এরূপ অবস্থায় তারা ভাবে যে বিপ্লবই জগতের দুঃখ দূর করবার চরম পন্থা। এই সব ধারণা মূর্খতা মাত্র এবং এই মূর্খতার পরিণাম পরাজয়।"

বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলেন, "রুষ কম্যুনিষ্ট বা সমাজতন্ত্রীরা কেবল নিজের দলের লোককেই প্রকৃত জন-সাধারণ বলিয়া মনে করে, তাহারা ভূ-সম্পত্তি ও বিষয়াধিকারকেই জগতের যত অনিষ্টের মূল বলিয়া বিবেচনা করে। রুষ সমাজতন্ত্রী তাহার এই মত সম্বন্ধে আপনাকে এতই অভ্রান্ত মনে করে যে তাহার আপন মত রক্ষার জন্য অর্থাৎ সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রের স্বার্থের জন্য কোনরূপ অত্যাচার করিতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হয় না। এজন্য সে নিজেও বর্ণনাতীত কষ্ট সহ্য করে। রুষ সমাজতন্ত্রী রোজ ষোল ঘণ্টা পরিশ্রম করে এবং শনিবারের ছুটিটা পর্য্যন্ত লইতে নারাজ। সে সর্ব্বপ্রকার বিপজ্জনক ও কঠিন কাজ করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। এমন কি পূতিগন্ধময় বিষাক্ত শবদেহ স্তূপ সরাইয়া মহামারী হইতে দেশকে বাঁচাইতেও কখন কুণ্ঠা বোধ করে না। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা রুষ সমাজতন্ত্রীর করতলগত হইলেও সে নিজে কঠোর সংযমে জীবন যাপন করে। সে নিজের ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কাজ করে না। তাহার সমস্ত উদ্যম ও চেষ্টা জগতে নব সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সে প্রাণপণে নিয়োগ করিয়াছে। যে উদ্দেশ্যে সে নিজেকে এতখানি কঠোরতার মধ্যে রাখিয়াছে ঠিক সেই উদ্দেশ্যেই সে অন্যের প্রতি নির্দ্দয় হইয়াছে।

বোলশেভিক মতে সামাজিক তন্ত্রের দুইটী মূল সূত্র হইতেছে—

শ্রম সকলকেই করিতে হইবে এবং আর একটী ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া কিছু নাই, সমস্ত সমাজের অধিকারভুক্ত। ব্যক্তিগত সম্পদকে বলশেভিকগণ পাপ ও অন্যায় বিবেচনা করে।"

মিঃ ওয়েলস্ রুষিয়াতে যখন যান তখন তিনি রুষিয়ার ছিন্ন ভিন্ন অবস্থা দেখিয়া রুষিয়ার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁর শঙ্কা লেনিনকে জানান। লেনিন তাহার উত্তরে বলেন, "অনুগ্রহ করে দশ বছর পরে এসে সোভিয়েট রুষিয়া দেখে যাবেন।"

আজ প্রায় দশ বছর হইয়া গেল। অনেক জ্ঞান-প্রিয় পুরুষ আজ সোভিয়েট রুষিয়ায় গিয়া তাহার আসল মূর্ত্তি দেখিয়া যে বিবরণ সব প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় লেনিনের ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হয় নাই।

সোভিয়েট রুষিয়ায় প্রত্যেক সংসারের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য হইয়াছে—শিশুর একান্ত মঙ্গল সাধন করা, শ্রমজীবি মেয়েদের মধ্যে গর্ভবতীরা পূর্ণ সময়ের আগে দু'মাস ছুটী পায়। এবং ছুটিতে পুরা মাইনে দেওয়া হয়। যে সমস্ত শিশুরা জগতে মাতার বা পিতার পরিচয় না নিয়ে আসে—তাদের আর অন্যসমস্ত শিশুদের মধ্যে কোনও সামাজিক পার্থক্য নেই। পোষ্যপুত্র নেওয়া আইনত বারণ, কারণ সমস্ত শিশুই ষ্টেটের সন্তান। সাধারণ শ্রমজীবিরা সোভিয়েট শাসনে আগেকার থেকে ঢের পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করে। এবং তাদের সাংসারিক জীবনও ঢের সংযত। কমুনিষ্ট দলের চেষ্টা যে তাদের সভ্যের মধ্যে অন্যায় ও দুর্নীতি যাতে সংযত হয়।

লেনিন ও সোভিয়েট রুষিয়া

লেনিনের আদর্শ ছিল রুষিয়ার মধ্যযুগের জীবন ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একেবারে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নূতন করিয়া তাহাকে গড়িয়া তুলিবেন। এক কথায় তিনি রুষিয়ার গ্রামকে আমেরিকার নগর করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। আজ রুষিরায় বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের উপর আস্থা রাখিয়া সব কিছু ভাঙ্গা এবং গড়া হইতেছে।

বোলসেভিস্‌ম্ ব্যক্তিত্ব বিশ্বাস করে না। সমূহের কল্যাণের নিমিত্ত ব্যক্তির বিলোপ একান্ত প্রয়োজনীয়। এই বিলোপের কারণ তাহারা নির্দ্দেশ করেন যে ব্যক্তির স্বাধীনতা ও বিলাসিতার আকাঙ্খা অন্য জীবনের দুঃখের মূল।

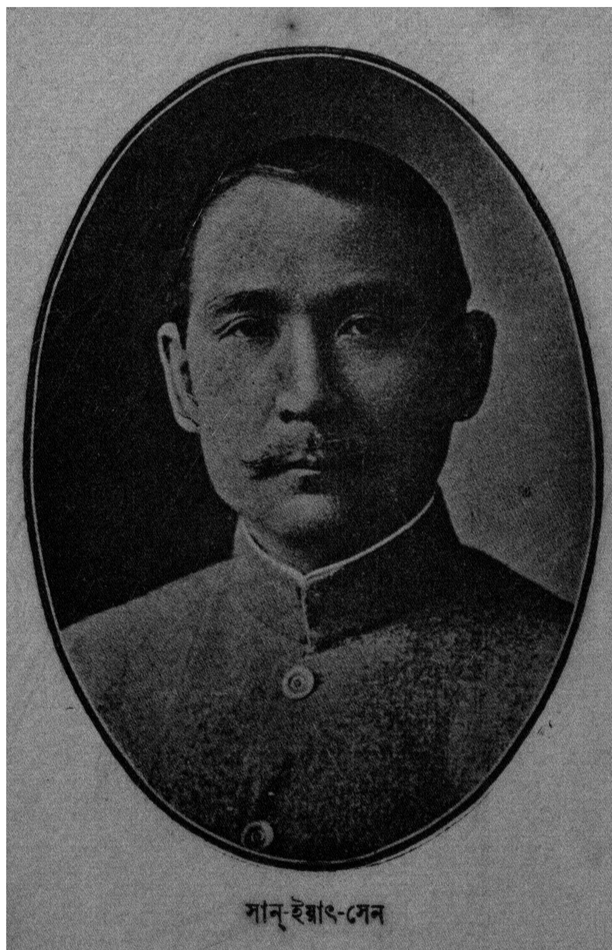
আজ সেভিয়েট রুষিয়ার যন্ত্রচালিত ব্যক্তিত্বহীন সমূহবাদের রাজ্যে—সাহিত্য, কাব্য, রঙ্গালয় সব কম্যুনিসিমের সেবা করিতেছে। সমূহবাদের বাহিরে ইহাদের কোনও অস্তিত্ব নাই।

একথা ঠিকই, আজ রুষিয়ায় একটা মস্ত বড় পরীক্ষা চলিয়াছে। তবে সামাজিক সমস্যায় সাক্ষাৎ পরীক্ষা ভয়াবহ।

সান্-ইয়াৎ-সেন ও চীনের কথা

চীনাদের কথা উঠলেই আমাদের মনে পড়তো শুধু আরশুলা আর বেটিঙ্ক ষ্ট্রিটের জুতার দোকান—আর হাওড়া পোলের নীচে চীনে ছুতোরদের কথা! চীনাদের সম্বন্ধে অনেকের চিন্তা এর বেশী দূর আর যেতে পারে না। পারবে কেমন ক'রে! চীন আর ভারতের মাঝখানে কি বিরাট ব্যবধান! একেবারে হিমালয়ের ব্যবধান!

তবু এক দিন ছিল যখন এত বড় একটা ব্যবধানকে তুচ্ছ ক'রে ...ীর পুরাতন প্রতিবেশী এই দুই জাতি আত্মীয়তা স্থাপন করেছিল। তুহিন-ভরা হিমালয়ের যে পায়ে হাঁটা পথ দিয়ে সভ্যতার পরমাত্মীয় পরিব্রাজকেরা যাতায়াত করতো—সে পথ



সান্-ইয়াৎ-সেন

আজ অদৃশ্য হয়ে গেছে। তখন এ দুই জাতি জেগে ছিল—তাই তাদের মাঝের পথও জেগেছিল। তার পর দুই জাতিই ঘুমিয়ে পড়ল——মাঝখানের পথেরও তন্দ্রা এল।

আজ আবার নূতন পৃথিবীর আলোকে নূতন করে জাগার পালা সুরু হয়েছে। পথে আবার নূতন পরিব্রাজক এসেছে। যেদিন রবীন্দ্রনাথ ভারতের প্রবুদ্ধবাণীকে নিয়ে চীনের দরজায় উপস্থিত হন—সে দিন মনে হয় পুরাণ আত্মীয়তার পুনরভিষেক হল। রবীন্দ্রনাথের চীন-ভ্রমণের ফলে স্মৃতির ঘুম-মহলের দ্বার খুলে সমস্ত পরিচয়ের নজির দলে দলে বেরিয়ে আসতে লাগলো। বাঙ্গালী ঐতিহাসিক গবেষণা করেছে চীন আর ভারতের সম্বন্ধ, চীন দার্শনিক গবেষণা করছে ভারত আর চীনের সম্বন্ধ। জ্ঞানের অমৃত-আলোকে এ অভিনব পরিচয়!

পরিচয় প্রগাঢ় হয় সম-বেদনায়। প্রশান্ত মহাসাগরের ওপার থেকে এক অসংখ্য রত্নালঙ্কারা ভিখারিণী কাঁদে আর বলে—হে পরমাত্মীয়া, যে-বেদনায় তুমি আজ অনাথিনী, সে বেদনায় আমিও ভিখারিণী।

এপারের ম্লান প্রদোষালোকে এক চীর-বাস পরিহিতা মহীয়সী নারী পীত-ধান্য-শীর্ষের অঙ্গুলী-ইঙ্গিতে প্রত্যুত্তর দেয়। ভাষা নাই তার—সে নির্ব্বাক।

দুই

আজকালকার জগতে দুটী পরস্পর-বিরোধী শক্তি সমান ভাবে বেড়ে চলেছে এবং দেশে দেশে যে সংঘর্ষের কথা আমরা নিত্য শুনছি—এ শুধু এই দুই শক্তির সংঘাতের ফল।

একটী সাম্রাজ্যবাদ আর একটী জাতীয়তা। চীনের বর্ত্তমান ইতিহাসের মূলে এই দুই শক্তির সংঘাত রয়েছে। ইয়োরোপীয় শক্তি তাদের সুবিধার অনুযায়ী চীনকে তাদের কাজে লাগাতে চায়—চীনেরা আপনাদের আত্ম-সম্মান বজায় রাখতে রীতিমত তার প্রতিবাদ শুরু করেছে এবং এই বাদ-প্রতিবাদের আনুসঙ্গিক ফলই হচ্ছে বিরোধ, বিসম্বাদ।

এই বিরোধ বিসম্বাদ দু' দিক দিয়ে দেখা যায়—একটী সাম্রাজ্যবাদীদের দিক দিয়ে, অন্যটী চীন জাতীয়তার দিক দিয়ে। প্রথমে সাম্রাজ্যবাদীদের দিক দিয়ে জিনিসটাকে দেখা যাক।

সাম্রাজ্যবাদ জিনিষটার স্বরূপ তা হ'লে প্রথমে জানা চাই।

সাম্রাজ্যবাদ জিনিসটা কি ?

ধাতুগত অর্থের দিক দিয়ে বলা যায় যে যে-শাসন প্রণালীর পরিচালক রূপে এক জন রাজা (অনেক সময় মন্ত্রী-সভার সহায়তা গ্রহণ করে) একেশ্বর রূপে থাকেন সেই শাসন-নীতিকেই সাম্রাজ্য-বাদ বলা যায়। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ তার ধাতুগত অর্থকে ছাড়িয়ে গিয়েছে।

অনেক শাসন প্রণালী আছে যারা আপনাদের Republican বলে—তারা কোনও রাজাকে স্বীকার করে না এবং তাদের শাসন-মণ্ডলী প্রতিনিধি-মূলক। যেমন ধরা যাক্—ফরাসী গভর্ণমেণ্ট। কিন্তু Republican হওয়া সত্ত্বেও ফরাসী জাতি সাম্রাজ্যবাদী এবং সাম্রাজ্যবাদের সমস্ত কলঙ্কই সমগ্র ফরাসী জাতির অঙ্গ বিকৃত করেছে। ফরাসীরা রীফে কি করলো? আনামে কি করছে? প্রত্যেক মূল জাতির সঙ্গে তার উপনিবেশের সম্বন্ধের মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ প্রকাশ পায়।

সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে একটা মনোভাব—কোনও বিশেষ শাসন-প্রণালী নয় এবং এই মনোভাবের রাজনৈতিক সংস্করণের অর্থ—লোভ ও স্বার্থপরতা।

সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে উপনিবেশ স্থাপনের একটা বিশেষ যোগ আছে। প্রত্যেক সাম্রাজ্যবাদী জাতি বা শাসনমণ্ডলী সর্ব্বদা উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টায় বিব্রত। উপনিবেশ না হলে সাম্রাজ্যবাদের কোনও অর্থ থাকে না। কাম্য-বস্তু না থাকলে লোভের সার্থকতা কোথায়? আর জগতে কে এমন আছে যে আপনার বাক্সের টাকায় আপনি লোভ করে? কাজেই পরের বাক্সের দিকে নজর পড়ে। তাই সাম্রাজ্যবাদ চায় উপনিবেশ—পরের রাজ্য।

সাম্রাজ্যবাদীরা আর এক কারণে উপনিবেশ স্থাপন চায়। গত যুগের কল-কব্জার বৃদ্ধির ফলে য়োরোপের তৈরী জিনিস-পত্তর প্রচুর পরিমাণে বেড়ে চলেছে। তার বাজার দরকার। এই সমস্ত

উপনিবেশই হচ্ছে য়োরোপের তৈরীমালের বাজার। অন্য দিকে য়োরোপের কল-কব্জা চালানোর উপযোগী কাঁচা মাল তো আর য়োরোপ সরবরাহ করে উঠতে পারে না। কাপড় তৈরী হবে য়োরোপের কলে—কিন্তু তুলো তো চাই। তুলো জোগাবে উপনিবেশগুলো। সেই তুলোতে যে কাপড় তৈরী হবে—কিনবেও আবার উপনিবেশের লোক। এই কেনা ও বেচার দু-তরফা লাভই যায় সাম্রাজ্যবাদীদের থলিতে।

একেই বলে সাম্রাজ্যবাদের শোষণ-নীতি। সমস্ত প্রাচ্য-জগৎ আজ এই শোষণ-নীতির চাপে বিশুষ্ক ম্লান হয়ে আছে।

চীনের বর্ত্তমান জাগরণের ইতিহাসের মূলে রয়েছে এই শোষণনীতির ব্যাপার।

চীনের জন্মদাতা সান্-ইয়াৎ সেনের জীবন বৃত্তান্ত বুঝতে হলে তাঁর জন্মাবার আগে চীনের অবস্থা বোঝা একান্ত দরকার।

চীনের সঙ্গে ইংলণ্ডের প্রথম সংঘর্ষ লাগে ১৮০০ সালে আফিঙের ব্যাপার নিয়ে। ইতিহাসে এই যুদ্ধ The Opium War বলে বিখ্যাত। চীন গভর্ণমেণ্ট আপনার দেশে বিদেশের আমদানী আফিঙের ব্যবসা বন্ধ করতে চায়। ফলে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তাকে হংকং এবং আরও পাঁচটী বন্দর ইংরাজদের দিয়ে দিতে হয়। ইংলণ্ডের পিছনে য়োরোপের অন্যান্য সব জাতি দেখা দিল। ফরাসী এসে আনাম অধিকার করলো, ভারতের কাছাকাছি ফরাসীকে দেখে ইংরাজ বর্ম্মা অধিকার করে বসলো। জাপান ও প্রতিবাসীর দিকে সুনজরে চাইলেন। তিনি কোরিয়া দখল করে বসলেন।

জার্ম্মাণ এসে কাউচাউ দখল করলো। এর পর এলো **Boxer Rebellion.** দুইজন জার্ম্মাণ প্রচারক **Shantung**এ নিহত হয়। তারই ফলে এই বিদ্রোহের অভ্যুত্থান হয়। অন্যান্য বিদেশী শক্তি এসে জার্ম্মানীর পাশে দাড়ালো। নগরের প্রধান অংশের চারিদিকে দুর্গ আর প্রাচীর তুলে তার মধ্যে য়োরোপীয়রা কায়েমী ভাবে দখল নিল। সেই প্রাচীর বেষ্টিত প্রদেশকেই বিখ্যাত **Legation Quarter of Peking** বলা হয়, এখানে চীনের আইন কানুনের কোন ও প্রভাব নেই। আপনার দেশে সে আপনি প্রবাসী। চীনের ব্যবসায়ের কেন্দ্র ও বন্দরগুলি আগলে বসে য়োরোপীয় শক্তিরা চীনের মধ্যে অবাধে তাদের শোষণ নীতি চালাতে লাগলেন।

এধারে দেশের মধ্যে দারিদ্র্য আর দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। বিদেশীদের দিকে চেয়ে অসহায় ভাবে চীনেরা দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

এই সময় চীনের ত্রাণ কর্ত্তা ও নব-চীনের জন্মদাতা সান্‌-ইয়াৎ সেনের আবির্ভাব হয়।

তিন

কোয়াং টাঙ্‌ প্রদেশের চোই হাঙ্গ নামে এক সামান্য গ্রামে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে সান্‌-ইয়াৎ সেন জন্মগ্রহণ করেন।

সানের পিতা ছিলেন খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী। সান্‌ বাল্যকালে তাঁদের

গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জ্জন করেন। কৃষির উপর নির্ভর করে তাঁদের চলতে হত তাই বালককালে তাঁকে ক্ষেতে তার পিতাকে সাহায্যও কর্ত্তে হতো।

ছেলেবেলা আমেরিকা ফিরৎ সমস্ত কুলীদের মুখে দূর দেশের সব বৃত্তান্ত শুনে বালকের রহস্য-আকুল মন তাদের ছোট্ট গ্রামটীর সীমানা ছাড়িয়ে অজানা পৃথিবীর দিকে এগিয়ে চলতো।

ছেলেবেলা থেকে সান্ বেশ গম্ভীর প্রকৃতির ছেলে ছিল কিন্তু তাঁর কিশোর মনটা ছিল বিশেষ সজাগ। চারিপাশের সমস্ত ঘটনা বালকের মনে নিত্য একটা না একটা ছাপ রেখে যেত। সেই সময় চীনে দস্যুদের উৎপাত ছিল নিদারুণ। চীনের ইতিহাসে এই দস্যুর দল বরাবরই আছে। লুণ্ঠনের দ্বারা আবহমান কাল থেকে এরা এদের বর্ব্বর জীবন-যাত্রা চালিয়ে আসছে। চীনের জাতীয় দলের বিরুদ্ধ শক্তি উ ফু ও চ্যাং-সো-লিন এই সমস্ত দস্যুদের নিয়েই তাঁদের সৈন্যমণ্ডলী গড়েছেন।

সানের গ্রামেও দস্যুর আক্রমণ হ'তো। কিশোর সান্ বিস্মিত হয়ে ভাবতো—এ অত্যাচার প্রতিরোধ হয় না কেন?

সানের যখন চৌদ্দ বৎসর বয়স তখন তাঁর প্রথম বিদেশ যাত্রার আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করবার অবসর এলো। সানের দাদা তখন হনলুলু দ্বীপে যাচ্ছিলেন। সান্ দাদার সহযাত্রী হলেন। চোইহাঙ্গের ক্ষুদ্র গণ্ডীর বাইরে কিশোর সানের মন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠ্‌ল।

হনলুলু দ্বীপে এসে সান্ এক ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি হন্ এবং

সেখানে তিন বৎসর কাল অধ্যয়ন করেন। সানের স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল—তাই তিনি এই সময়ের মধ্যেই ইংরাজী ভাষা বেশ আয়ত্ত করে নেন।

হনলুলুর এই আমেরিকান্ বিদ্যালয় সানের মনে বিষম পরিবর্ত্তন আনে। আপনার দেশের ও জাতির অসংখ্য কুসংস্কার ও একান্ত ভ্রান্ত অতি-প্রাচীন সব ধারণার উপর তার নজর গিয়ে পড়ল।

চারিদিকে অজ্ঞতা—সকলেই যেন দরজা-জানালা বন্ধ ঘরের মধ্যে আবহমান কাল থেকে বসে আছে আর ভাবছে—এই ঘরটাই সমস্ত বিশ্ব। জীবনের চারিদিকে এই সব দীনতা ও দুর্ব্বলতা দেখে উন্মুখ-যৌবন সানের মনে সংস্কারের বাসনা জাগে।

নিশিদিন এই সমস্ত চিন্তার ফলে সান্ ঠিক করলেন যে তিনি প্রথমে আপনার গ্রামেই এই সংস্কারের কাজ আরম্ভ করবেন এবং বক্তৃতা দ্বারা গ্রামের লোককে বোঝাবেন যে কি ভীষণ অজ্ঞতার মধ্যে তারা সব নিশ্চিন্ত মনে বসবাস করছে। আর তাদের দেশের বাইরে জগতে কত রূপান্তর ঘটে চলেছে। গ্রামবাসীদের বুঝিয়ে দিতে হবে—এ শাসক-সম্প্রদায় দিয়ে দেশের কোনও কাজ হবে না—আর এরা কে? এরা তো মাঞ্চু—বিদেশীয়। চীন কেন বিদেশীয় রাজার অধীনে দাসত্ব করবে?

অবশেষে সান্ গ্রামে এই সব কথা সত্যই প্রচার করে বেড়াতে লাগলেন। সমাজের বৃদ্ধরা সমাজের অপমানকারী যুবকের

ঔদ্ধত্যে নির্ব্বাক হয়ে গেলেন। সানের বাণীও দিন দিন রাজ-দ্রোহজনক ও সমাজ-বিধ্বংসী হয়ে উঠ্‌তে লাগলো।

চীনের অভ্যন্তর এখনও হাজার বছর পিছিয়ে আছে। তাই সেদিন পঞ্চায়েৎ করে সানকে গ্রাম থেকে নির্ব্বাসিত করে দেওয়া হল।

জীবনে এই প্রথম দুঃখের রাজটীকা!

হংকংএ এসে সান্ ইংরাজ-পরিচালিত Queen's Collegeএ ভর্ত্তি হন। এখানকার পাঠ শেষ করে সান্ ডাক্তারী পড়বেন ঠিক করলেন। তখন সবেমাত্র হংকংএ একটা ডাক্তারী কলেজ খোলা হয়েছে। সেখানকার ডিপ্লোমা নিয়ে সান্ একজন পুরাদস্তুর ডাক্তার হলেন।

সান্ ক্যানটনে এসে ডাক্তারী করতে লাগলেন—কিন্তু তাঁর মন পড়ে রইল—সেই গ্রামের পঞ্চায়েতের দিকে—যেখানে রয়েছে শুধু অজ্ঞতার অন্ধকার আর মিথ্যা আচারের অহমিকা।

এই সময় চীন যুবকগণ মিলিত হয়ে "তরুণ চীন সঙ্ঘ" বলে গোপনে এক বিদ্রোহের দল গঠন করে। সান্ তাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে—ডাক্তারীর অভিনয়ের অন্তরালে দেশের মধ্যে অক্লান্তভাবে বিদ্রোহের বাণী প্রচার করতে লাগলেন। তাঁর ডাক্তারখানা হয়ে উঠলো বিদ্রোহীদের প্রধান আড্ডা।

এই সময় (১৮৯৫) মাঞ্চু-পুলিশ এই দলের খবর পেয়ে আঠারো জন যুবককে ধরে—এবং তাদের সকলের ফাঁসী হয়।

পিকিঙের রাজদরবার থেকে তখনি চীন পরিত্যাগ করে যাবার হুকুম সানের উপর জারী হল।

সান্ আমেরিকায় এলেন এবং সেখানকার প্রবাসী চীনাদের মধ্যে প্রচার কার্য্য করে অর্থ ও অস্ত্র সংগ্রহ করে তিনি ছদ্মবেশে চীনে প্রবেশ করলেন। তখন চীনের মনো সহরে ছোট ছোট বিদ্রোহ সমিতি স্থাপিত হয়েছিল। সান্ সেই সমস্ত অস্ত্র নিয়ে ক্যানটনের শাসনকর্ত্তার দুর্গ আক্রমণ করবেন বলে মনস্থ করেন; কিন্তু এবারেও তিনি বিফল মনোরথ হন—এবং এই ঘটনার আগেই তাঁর সহকর্ম্মীরা সকলেই ধরা পড়ে। পুলিশ কিন্তু সানকে ধরতে পারে নি।

সানের মাথার উপর পুরস্কার ঘোষনা করা হল। এই ঘোষণায় সান্ চীন পরিত্যাগ করে হাওয়াই দ্বীপে আসেন। তারপর সেখান থেকে আমেরিকা হয়ে অবশেষে য়ুরোরোপে আসেন। পথে যেখানে সুবিধা পেয়েছিলেন সেখানেই সান্ প্রচার কার্য্য চালিয়েছেন।

ইংলণ্ডে এসে সানের জীবনে এক রহস্যময় ঘটনা ঘটে। সান্ অপহৃত হয়ে যান। অবশেষে লণ্ডনের বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ বিভাগ তাঁকে অনেক কষ্টে উদ্ধার করেন। এইখানে একজন মহানুভব ইংরেজের নাম করা একান্ত প্রয়োজন—তাঁর নাম ডাক্তার ক্যানটাইল। ডাক্তার ক্যানটাইলের স্নেহ, যত্ন ও সহায় সানের জীবনের একটা মস্ত বড় সম্পদ।

ইংলণ্ড থেকে চীনে বিদ্রোহের কাজের সুবিধা নাই দেখে সান্

মৃত্যু হাতে করে ছদ্মবেশে জাপানে এলেন। জাপান থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের সমস্ত দ্বীপে যেখানে যেখানে চীনা উপনিবেশ আছে সেখানে সেখানে সান্ চীনের মুক্তির বাণী নিয়ে বেড়ালেন। অবশেষে ছদ্মবেশে তিনি আবার চীনে প্রবেশ করেন। এবং সুদূর গ্রামে গ্রামে স্বাধীনতার ও সংস্কারের বাণী প্রচার করে বেড়াতে লাগলেন। কিন্তু মাঞ্চু পুলিশ তাঁর গন্ধ পেয়েছিল। কিছুদিন পরে তাঁকে আবার য়ুরোপ যাত্রা করতে হয়।

এই সময় মাঞ্চু রাজপরিবার ও শাসন তন্ত্রের মধ্যেও গোলমাল দেখা দেয়। বারবার বিদেশীদের হাতে পরাজিত হয়ে তাদের শক্তির ভাণ্ডারও নিঃশেষ হয়েছিল। রাজ্যের সমস্ত ভারই ছিল বিচক্ষণ ও কূট বুদ্ধি উয়ান্ শি-কাইএর প্রতি।

১৯১১ সালের ১০ই অক্টোবর প্রকাশ্যভাবে চীনা বিপ্লবী দল যুদ্ধ ঘোষণা করলো এবং দলে দলে এই বিপ্লবীদের সৈন্যদল পুষ্ট হতে লাগলো। বিপ্লবীরা আগে থেকে রাজ সৈন্যের এক অংশকে বশীভূত করেছিল। বিদ্রোহের অগ্নি শিখা সমস্ত চীনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো।

মাঞ্চুরাজ উয়ান্ শি-কাইএর হাতে রাজ্যভার দিয়ে পলায়ন করেন। উয়ান্-শি-কাই এসে জাতীয় দলের সঙ্গে যোগদান করেন। চীনের এতদিনের সাম্রাজ্যবাদ ভেঙ্গে চীন-গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল ক্যানটন সহরে। সানই চীন-গনতন্ত্রের প্রথম

সভাপতি হলেন। কিন্তু উয়ান্-শি কাইকে শাসন পরিচালন যোগ্যতর মনে করে উয়ান্-শি-কাইকে সভাপতির আসনে বসান।

সান্ এই সময় জাতির অন্তরের দিকে ফিরে চাইলেন। এবং তার সংস্কারের দিকে পূরামাত্রায় আপনাকে নিয়োগ করলেন। শিক্ষা, রেলপথ, বহির্বাণিজ্য, প্রেস, কলেজ, এই সমস্ত বিস্তার ও স্থাপনার জন্য সান্ প্রাণপন চেষ্টা করতে লাগলেন।

কিন্তু এধারে আর এক গণ্ডগোল বেঁধে গেল। বিদ্রোহীর দল উয়ান্-শি কাইকে যত ভাল-মানুষ মনে করেছিলেন সভাপতির আসন পরিগ্রহণ করার কিছুকাল পরেই দেখা গেল তিনি ঠিক বিপরীত। উয়ান্-শি-কাই আপনার আদেশে ক্রমশঃ বিপ্লবীদের নানা মিথ্যা অজুহাতে একে একে ফাঁসী দিতে লাগলেন। পাছে সাধারণ-তন্ত্রী দল গোলমাল ক'রে সেইজন্য ঘুষ দিয়ে সৈন্য সামন্ত সমস্তই হাতের মধ্যে করে রেখেছিলেন।

সান্ দেখলেন সমূহ বিপদ। সান্ এবং তাঁর অনেক সহকর্ম্মী অগত্যা জাপানে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। এধারে উয়ান্-শি-কাই আপনাকে চীনের সম্রাট বলে ঘোষণা করলেন। কিন্তু কিছু কাল রাজ্য-ভোগ করার পরেই উয়ান্-শি-কাই পরলোক গমন করে। তখন আবার চীন সাধারণ-তন্ত্র স্থাপিত হয়।

এখানে একটা কথা বলার প্রয়োজন যে চীন দেশ নানা বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত। এবং এই সমস্ত প্রদেশের শাসনকর্ত্তারা একরকম

স্ব স্ব স্বাধীন ভাবেই থাকে। উয়ানের মৃত্যুর পর সমগ্র চীনে একটা ভীষণ অরাজকতা আসে। এবং তার ফলে এই সমস্ত প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারা অধিকার ক্ষমতার জন্য লালায়িত হয়ে আপনাদের সৈন্যসামান্ত নিয়ে লুণ্ঠন ও রাজ্য অধিকার আরম্ভ করে দিল। এবং এই লুণ্ঠনের ব্যাপারে এদের পরস্পরের মধ্যে ভীষণ অন্তদ্রোহ দেখা দিল।

এধারে জাপান থেকে সান্ ফিরে এসে ক্যানটন সহর দখল করে সেখানে চীন সাধারণ-তন্ত্র স্থাপনা করলেন এবং বিখ্যাত কোওয়ামিম্‌টাঙ অর্থাৎ জাতীয় সেনা দলের সৃষ্টি করলেন। সান্ ভেবেছিলেন যে তাঁর কোওয়ামিংটাঙ দল সমস্ত দক্ষিণ চীন অধিকার করে ফেলবে কিন্তু তিনি উত্তর চীনের একজন শক্তিশালী প্রাদেশিক কর্ত্তার বাধা পেলেন। তাঁর নাম উ-পেই-ফু। এখানে আর একজন প্রাদেশিক শাসন কর্ত্তার নাম করা দরকার। তিনি মাঞ্চুরিয়ার অধিপতি চ্যাং-সে-লিন। উ-পেই ফু চ্যাং-সো লিনকে পরাজিত করে পিকিঙ্ শহর দখল করেন।

চীনের দুর্ভাগ্য যে সেই বিষম অরাজকতা ও দুর্য্যোগের সময় তার নব জন্মদাতা রোগশয্যা গ্রহণ করেন এবং সেই রোগই তাঁর মৃত্যুর কারণ হল। সমগ্র চীন জাতি অনাথ হল।

মৃত্যুর সময় সান জাতির কাছে তাঁর শেষ মর্ম্মকথা উইল করে দিয়ে যান—

"ক্রমান্বয় চল্লিশ বৎসর ধরে চীনের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখবার জন্য জাতির বিপ্লব কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেছিলাম।

এই দীর্ঘ চল্লিশ বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে এই কথা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝেছি যে আমরা আমাদের কাম্য বস্তু নিশ্চয়ই করায়ত্ত করতে পারবো যদি আমাদের আদর্শকে অক্ষুন্ন রেখে আর বিশ্বের কল্যাণের দিকে চেয়ে যাঁরা আমাদের সমান ভাবতে পারেন তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতার সুপ্ত গণশক্তিকে জাগিয়ে তুলতে পারি।”

সানের মৃত্যুর পর চীনের মধ্যে এই সমস্ত প্রাদেশিক শাসন কর্ত্তাদের নিয়ে ভীষণ অন্তদ্রোহ চলেছে, উফু ও চ্যাংসেলিনের বিরুদ্ধে কুর্ত্তমিনচুণ দল ও কেজের সেনাপতিত্ব দাঁড়ায়।

এই জন-সেনাপতির আদর্শ ও জীবন যাত্রার ধরণ সম্পূর্ণ আলাদা। চাং ও উফু জাতীয় দলের শত্রু। কারণ তারা জানে যে জাতীয় দলের প্রাধান্য হলে চীন থেকে তাদের একেবারে সমূল উচ্ছেদ ঘটাবে। কারণ জাতীয় দল এদের দস্যু বলে জানে।

জেনারেল চ্যাং হচ্ছেন একজন ভীষণ বিলাসী লোক। তাঁর বিলাস ভবন বার-বিলাসিনীতে ভরা। জাপানের সঙ্গে তাঁর সদ্ভাব বেশী কারণ জাপান আর মাঞ্চুরিয়া বড় কাছাকাছি।

জেনারেল উ হচ্ছেন একজন গোঁড়া লোক। পুরানো পুঁথির উপর অগাধ শ্রদ্ধা; শ্রমিক আন্দোলনের তিনি সব চেয়ে বড় শত্রু।

জেনারেল কঙ্‌ সম্পূর্ণ বিপরীত লোক। তিনি যে ঘরে থাকেন সে অতি সামান্য, নগন্য। চাষাদের মধ্যে তাঁর প্রচার কার্য্য। সোভিয়েট রুষিয়ার সঙ্গে তাঁর মিতালী।

সানের সুযোগ্য পত্নীর অধিনায়কত্বে এখন কোওমিণ্টাঙ দল পরিচালিত হচ্ছে। এবং সোভিয়েট রুষিয়া চীনের স্বাধীনতার সংগ্রামে চীনের জাতীয় দলের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

সানের আদর্শ ক্রমশঃ তাঁর দলের মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠছে এবং অচিরেই যে চীন অন্তবর্জ্জন থেকে মুক্ত হয়ে বিপুল উদ্যমে জাগবে সে বিষয়ে কারও সন্দেহ নেই।



মুসোলিনী

মুসোলিনী ও জাতীয়তা

আজ আমরা যাকে ফ্যাসিস্‌ম্‌ বলি এবং যার স্বরূপ সম্বন্ধে নানা বিচিত্র রহস্যময় ধারণার বশীভূত হই সেটা হচ্ছে—ছদ্মবেশী জাতীয়তা। ফ্যাসিস্‌ম্‌ সমগ্র জাতীয়তার প্রতিমূর্ত্তি এবং জগতের সমস্যার সঙ্গে তার ঐ খানেই যোগ এবং সংঘর্ষ। ফ্যাসিস্‌ম্‌ ইতালীকে সাময়িক ভাবে বাঁচাতে পারে কিন্তু জগতের অন্যান্য রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক সমস্যা—যা সহসা আজ যে কোনও দেশে জেগে উঠতে পারে তার সমাধানে কতদূর সফল হবে—সেই নিয়েই বাদ বিতর্ক। এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয় ফ্যাসিস্‌ম্‌ এক রকম আন্তর্জ্জাতিকতার শত্রু। এই কারণেই কমুনিষ্টদলের সঙ্গে ফ্যাসিস্টির এত বিরোধ।

আন্তর্জ্জাতিকতার অথবা বিশ্ব-মানবতার দিক দিয়ে দেখলে ফ্যাসিস্‌মকে শুধু একটা ব্যক্তির অসীম সাহস, শক্তি, কর্ম্ম-কুশলতার উদাহরণ ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। ফ্যাসিস্তিরা আপনাদের মতবাদকে ইতালীর মধ্যে চালাতে মানবের নানা সহজ অধিকারের বিরুদ্ধে যে বর্ব্বরোচিত কাজ সব করেছে তাতে সমস্ত বিশ্ব স্তম্ভিত হয়েছে। ফ্যাসিস্তির বিরুদ্ধ-মতাবলম্বী সমস্ত লোকদের, সে তাঁরা যত বড়ই বিখ্যাত বা পণ্ডিত ব্যক্তি হন না কেন নির্ব্বাসন, মৃত্যু, না হয় বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে। ফ্যাসিস্তির বিরুদ্ধ প্রেসে সহসা মধ্য রাত্রে ফ্যাসিস্তি সৈন্য পড়ে প্রেস ভেঙ্গে কাগজ পত্র পুড়িয়ে কাগজের লীলা অবসান করে চলে গেছে। রাত্রে লোকে স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়ে নিদ্রিত সেখানে গিয়ে তাদের তুলে স্ত্রী, পুত্রের সম্মুখে মেরে ফেলা হয়েছে। আমরা পরাধীন জাতি—এত দিন পরাধীন যে স্বাধীনতার কোনও অভিব্যক্তির স্বরূপ আমরা বুঝিনা। হয়ত—রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত করতে হলে এমনই নির্ম্মম হ'তে হয়। দুর্ব্বল জাতিকে সবল করে তুলতে হয়ত এমনই ব্যক্তিত্বের, একান্ত প্রভুত্বের প্রয়োজন।

কিন্তু ইতালীর দিক থেকে ফ্যাসিস্‌মের আলাদা স্বরূপ। ফ্যাসিস্‌ম্ ইতালীকে শক্তি দিয়াছে তার দ্বন্দ্বময় অলস জীবনে একটা কর্ম্মময় আদর্শের প্রেরণা এনেছে। মুসোলিনী ইতালীর যৌবনকে জাগিয়েছেন, মুসোলিনী তাঁর প্রবর্ত্তিত নীতি সম্বন্ধে একবার বলেন যে ফ্যাসিস্‌মকে ইতালীর ইতিহাস থেকে আলাদা করে দেখা ভুল; ইতালীকে মিলিত করে একটা পরিপূর্ণ জাতিগঠন করবার যে

চেষ্টা এতদিন ধরে চলে এসেছে, ফ্যাসিস্‌মৃই সেই মিলিত ইতালী গড়ে তুলতে পেরেছে।

ইতালীর অতীত ইতিহাসে দেখা যায় যে ইতালীর বিভিন্ন প্রদেশগুলি কখনও আপনাদের মধ্যে এক হইতে পারে নাই। রোম যখন সভ্যতার শিখরে সমাসীন তখনও এই সমস্ত বিভিন্ন প্রদেশ রোমের প্রভুত্ব স্বীকার করিত বটে কিন্তু, কোনও প্রতিবেশী প্রদেশ আর এক প্রতিবেশীর কোনও রকম অধীনতা স্বীকার করিত না; এবং এই জন্যই ইতালীর রাজনৈতিক জীবন গৌরবের শৃঙ্গ হইতে সহসা নির্ব্বীর্য্যতার পঙ্কে নিপতিত হয়। গত দুই শত বৎসর ধরিয়া ইতালীতে যে জাগরণের আন্দোলন চলিতেছে এবং যাহার পরিণতি বর্ত্তমান কালে ফ্যাসিস্তি আন্দোলনে দাঁড়াইয়াছে —তাহার মূল উদ্দেশ্য হইতেছে যে, ইতালীর স্ব স্ব স্বাধীন এই সমস্ত প্রদেশগুলিকে একত্রিত করিয়া মিলিত ইতালী গড়িয়া তোলা। জাতীয়তার দীক্ষা-গুরু ম্যাট্‌সিনী ও গ্যারিবল্ডী এই মিলিত-ইতালীর বাণী প্রচার করেন, তাহার একটা বিশিষ্ট রূপ দিতে আমরণ চেষ্টা করেন—কিন্তু কাজে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। মুসোলিনী ইতালীর ইতিহাসের এই অসাধ্য সাধন করেছেন বলে দাবী করেন।

ফ্যাসিস্তী আন্দোলন এবং তার প্রবর্ত্তক মুসোলিনী সমস্ত সভ্য জগতের মধ্যে একটা বিরাট আন্দোলনের সৃষ্টি করেছে। সাম্যবাদীর দল মুসোলিনীর নাম সহ্য করিতে পারে না, কারণ পরে বিবৃত হইবে। প্রথমে ফ্যাসিস্তির অভ্যুদয়ের প্রধান অন্তরায়ই ছিল

সাম্যবাদীর দল। তাহাদের কাছে মুসোলিনী নর-পিশাচ—মানবতার প্রতি তাঁহার এক বিন্দুও করুণা নাই—(অনেকটা এই রকম ভাবেই এককালে সাম্রাজ্য-বাদীরা লেনিনকে অঙ্কিত করিয়াছিল)। সাম্যবাদীরা জন-গণের মিলিত শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া যে বিশ্ব-সাম্রাজ্যের কল্পনায় কাজ করিতেছেন—মুসোলিনীর আদর্শ ঠিক তাহার বিপরীত। সাম্যবাদীরা যতখানি জনগণের উপর আস্থাবান, ফ্যাসিস্তিরা ততখানি ব্যক্তির উপর আস্থাশীল।

ইংরাজদের রাজনৈতিক মহলে মুসোলিনী সম্বন্ধে নিন্দার অপেক্ষা প্রশংসাই অধিক শোনা যায়। কিন্তু এই সমস্ত প্রশংসার অন্তরালে ঘৃণা ততটা নাই—যতটা আছে ভয়। রোমের অতীত আদর্শ—রোমই জগতের সাম্রাজ্যের কেন্দ্র—ইহাই মুসোলিনীর সমস্ত অন্দোলনের পশ্চাতে অনুপ্রেরণা জোগাইতেছে।

ইতালীতে মুসোলিনীকে এক দল জীবনমরণ পণ করিয়া শ্রদ্ধা করে ও ভালবাসে; আর একটী দল আছে, তাহারাও জীবণ-মরণ পণ করিয়া মুসোলিনীকে ঘৃণা করে। অবশ্য শেষোক্ত দলের সংখ্যা কম এবং তাহাদের সকলকেই নানা উপায়ে মূক ও নিষ্ক্রিয় করিয়া রাখা হইয়াছে। প্রথম দলের নিকট মুসোলিনী জাগ্রত ইতালীর মূর্ত্তিমান প্রতীক্। জাতীয়তার এক উদগ্র-মূর্ত্তি সমস্ত ইতালীকে আজ ছাইয়া ফেলিয়াছে। ইতালীর এই জাতীয়তার নাম **Italianity.** (ইতালীয়তা)। ইতালীয়তার উপাসক এই ফ্যাসিস্তিদের নিকট ইতালীর বাহিরে আর কিছুই নাই। বিশ্ব

ডুবিয়া যাক্ ইতালী বাঁচিয়া থাকুক ! এই যে জাতীয়তার অথবা ইতালীয়তার বিষম বন্যা ইতালীয় যুবকদের মনকে পাইয়া বসিয়াছে তাহার প্রচারক মুসোলিনী হইলেও তিনি তাহার প্রবর্ত্তক নন্। ইতালীয়তার মন্ত্র এই যুগে আবার পুনরুজ্জীবিত করেন বর্ত্তমান ইতালীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক কবি ও নাট্যকার—গ্যাব্রিয়েল ড'হ্নুন্ৎসিও (Gabriel D'Anuanzio)। ফ্যাসিস্তি আন্দোলনের বিষয় আলোচনা করিতে হইলে ড'হ্নুন্ৎসিওর বিষয় আলোচনা একান্ত প্রয়োজনীয়। ড'হ্নুন্ৎসিও তাঁহার কোনও বিখ্যাত পুস্তকে তাঁহার প্রধান নায়কের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন যে, একমাত্র এই লাতিন জাতির রক্তে সভ্যতা আছে, তাহার বাহিরে আর সব বর্ব্বর। এই সমগ্র ইতালীয়তায় আজ ফ্যাসিস্তি যুবকের মন মগ্ন হইয়া আছে। মুসোলিনী স্বয়ং এক বক্তৃতায় একবার বলেন, "Let all political parties disappear, even our own party, if necessary, in order that our County may be great." সমস্ত দল লুপ্ত হইয়া যাক, যদি প্রয়োজন হয় আমাদের দলও লুপ্ত হইয়া যাক, যদি ইতালী গৌরবে বাঁচিয়া থাকিতে পারে।"

বর্ত্তমান ইতালীর পরিচালক ও ফ্যাসিসিমের জীবন বৃত্তান্ত বিচিত্র। জীবনের অতি নিম্নস্তর থেকে তিনি আসেন এবং নানা দুঃখ দৈন্য ও অভিজ্ঞতার মধ্যে যে শক্তি অর্জ্জন করেন আজ তাঁর ব্যক্তিস্বরূপে তাহা সমস্ত পৃথিবীকে স্তম্ভিত করেছে।

মুসোলিনী ইতালীর রোমানা প্রদেশের একজন সামান্য

কর্ম্মকারের ছেলে। একজন সামান্য কর্ম্মকারের ছেলে একদিন সমস্ত য়ুরোপের বিস্ময়ের মূর্ত্তি হয়ে উঠবে—ইতিহাসের এ খেয়াল নূতন নয়। কর্সিকার একজন সামান্য আইনব্যবসায়ীর পুত্র একদিন ইউরোপের অধীশ্বর হ'য়েছিলেন।

মুসোলিনি সাধারণের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন—; সাধারণ জীবনের তীব্র দুঃখময় অভিজ্ঞতা ও কঠোরতার ভিতর দিয়ে তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের দৃঢ় মনুষ্যত্বের ভিত্তি গড়ে' উঠেছিল। কিন্তু সামান্য দরিদ্র বংশে জন্মগ্রহণ করলেও মুসোলিনির একটা বংশমর্য্যাদা ছিল। ইতালিতে অধিকাংশ পরিবারই যতই কেন নিঃস্ব হ'ক না তাদের প্রত্যেকের একটা গৌরবময় অতীত আছে —যার থেকে তারা কোন রকমে পৃথক হ'তে চায় না। মুসোলিনির বংশ বহুকাল হ'তে ইতালীর ইতিহাসে সগৌরবে আছে। এখনও ইটালীতে Via dei Mussolini নামে তাঁদের পূর্ব্বপুরুষের গৌরবের স্মরণ চিহ্ন স্বরূপ একটী রাস্তা আছে।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে প্রেডাপিওতে বেনিটো মুসোলিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম এলেসান্দ্রো মুসোলিনি। তিনি সেই গ্রামেরই কর্ম্মকার। বেনিটোর মাতার নাম রোসা মালটোনি। তিনি সেই গ্রামের একটী নিম্নশ্রেণীর পাঠশালার শিক্ষকরূপে ছিলেন।

বেনিটো তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের যে রাষ্ট্রীয় শক্তির অধিকারী হয়েছিলেন তার বীজ তিনি আপনার রক্তে নিয়ে এসেছিলেন।

বেনিটোর পিতা ছিলেন একজন অসমসাহসিক লোক এবং তিনি আন্তর্জ্জাতিক রাজনৈতিক বিদ্রোহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হ'য়ে একবার বিচারে দণ্ডিত হন।

বেনিটো অতি অল্প বয়সেই ভয়ানক একগুঁয়ে এবং সাহসী ছিলেন। অবাধ্যের একশেষ এবং দারুণ তেজী এই বালক বাল্যেই ভবিষ্যত ইতালীর ভাগ্যনিয়ন্তার গুণগুলি আয়ত্ব করেছিল। ছেলের অন্তরের এই তেজব্যঞ্জনা দেখে বেনিটোর পিতা তাকে কোনরকমে ফাএনজা সহরের কলেজে অধ্যয়নের জন্য ভর্ত্তি ক'রে দেন। বেনিটোর এই পড়ার খরচ যোগাতে তাঁদের ভয়ানক কষ্ট পেতে হয়েছিল। পাঠ্যবস্থায় বেনিটো অদ্ভুত ধীশক্তিসম্পন্ন ছিলেন, কিন্তু তাঁর উদ্দামতার কিছুই হ্রাস হয় নি। কোনও নিয়মের প্রতি কারও রক্তচক্ষুর ভয়ে ছাত্র বেনিটো কখন মাথা নোয়ায়নি। যে সমস্ত বিষয় তাঁর ভাল লাগত বিনা পরিশ্রমে অনায়াসে তিনি তা আয়ত্ব করতেন; কিন্তু কোনদিন কলেজের কর্ত্তৃপক্ষের শাসন মানতেন না। এধারে তিনি খুব গম্ভীর ও নির্জ্জনতায় থাকতে ভালবাসতেন। কিন্তু তাঁর চরিত্রে এমন একটা আকর্ষণী শক্তি ছিল যে নির্জ্জনতাপ্রিয় ও গম্ভীর প্রকৃতি হলেও কলেজের সমস্ত ছেলে বেনিটোকেই দলপতি ব'লে মেনে নিয়েছিল এবং প্রায়ই কলেজের অধ্যয়নের সময় বেনিটো সমস্ত ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে কলেজ থেকে বেরিয়ে অদূর গ্রামের মধ্যে চলে যেত। বেনিটোর এরকম ব্যবহারে কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ

বিষম ক্রুদ্ধ হ'য়ে উঠলেন এবং একদিন বেনিটোকে তার এই কলেজের আইন অমান্য করার জন্য কলেজ থেকে একেবারে তাড়িয়ে দেওয়া হ'ল। বেনিটোর বাবা ভয়ানক চটে গেলেন এবং অনেক বকাবকির পর বেনিটোকে ফোরলীর স্কুলে পাঠিয়ে দেন; সেখান থেকে বেনিটো স্কুলমাষ্টারের খেতাব নিয়ে বেরিয়ে আসেন। বেনিটোর তখন মাত্র আঠার বছর বয়স। তখন তিনি গোয়ালটেরিতে একজন স্কুলমাষ্টাররূপে নিযুক্ত হন।

মুসোলিনির চরিত্রের যে একটা দিক আছে যা কোন বাধা মনেতে চায় না—দারুণ স্বেচ্ছাচারী ও অমিবিক্রম তা তার এই ছাত্রজীবনে ও যৌবনের প্রারম্ভে পরিস্ফুটভাবে তাঁর মধ্যে ছিল। মুসোলিনির চরিত্রের আর একটা দিক এই যে তিনি যখন যা অন্তরের সঙ্গে চেয়েছেন, তা সার্থক ক'রে তোলবার জন্য সমস্ত দেহ মন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত। মুসোলিনি একজন প্রসিদ্ধ নেতা কঠোর স্বেচ্ছাচারী, কিন্তু যারা মুসোলিনির লেখা ও বক্তৃতা পড়েছেন তাঁরা তাঁর চরিত্রের আর একটা দিক জানেন যে, মুসোলিনি দারুণ ভাবপ্রবণ এবং সাহিত্যিক। মুসোলিনির লেখার তেজ ও ধরণ ইটালীর মহাপুরোহিত ম্যাটসিনির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ম্যাটসিনির প্রত্যেক বাণীর মধ্যে ছিল একটা বৈদ্যুতিক, একটা জলন্ত জীবন্ত মূর্ত্তি। মুসোলিনির কথায় ও বক্তৃতায়ও তাই। সামান্য ছোট ছোট পদ ও কথাগুলি এক একটা গুলির মত এবং তাতে তেজ ও ভাবশীলতা প্রচুর পরিমাণে

থাকার দরুণ শ্রোতার অন্তঃকরণ অনেক সময়ে শ্রোতার অজ্ঞাতেই জয় ক'রে ফেলে।

এই যে সাহিত্যপ্রবণতা ও ভাবশীলতা—বেনিটো তাঁর পঠদ্দশাতেই অর্জ্জন করেন। সাহিত্যের প্রতি মুসোলিনির একটা তীব্র অনুরাগ আছে এবং পঠদ্দশার অনেক নির্জ্জন অবসরে তিনি লেখনী আর পুস্তক নিয়ে সানুরাগে কাটিয়ে দিতেন। এবং পরবর্ত্তী জীবনে তিনি বহুবার জীবনের বহুসময় এই অধ্যয়নেই অতিবাহিত করেছেন। এই সময় তিনি কবিতা ও নভেল লিখেছিলেন; সেগুলি লেখার রীতিনীতির দিক দিয়ে খুব পরিমার্জ্জিত না হলেও তা'তে প্রাণশক্তি ও প্রকাশভঙ্গী অপূর্ব্ব ছিল। এই সময় বেনিটোর চরিত্রে তাঁর পিতার আধিপত্য অপেক্ষা তাঁর মায়ের আধিপত্যের ছাপ খুব বেশীরকম ছিল। বেনিটোর পিতা ছিলেন একজন দারুণ বিপ্লবমতবাদী এবং এমন কি ধর্ম্মবিদ্বেষী, কিন্তু বেনিটোর মাতা ছিলেন একজন ধীর বুদ্ধিমতী ধর্ম্মভীরু রমণী। বেনিটো যদিও গির্জ্জার আধিপত্যে অনেক সময়ে চঞ্চল হয়ে উঠতেন, তাঁর অন্তরে কিন্তু একটা প্রবল ধর্ম্মবিশ্বাস সুপ্ত ছিল।

স্কুলমাষ্টার অবস্থায় মুসোলিনি সম্বন্ধে খুব বেশী কিছু জানা যায় না, শুধু এই জানা যায় যে শিক্ষক হিসাবে মুসোলিনি ছাত্রমণ্ডলীর খুব প্রিয় ছিলেন এবং অবসর সময় তিনি অধ্যয়নেই কাটাতেন।

কিন্তু স্কুলমাষ্টারের এই শান্ত গতানুগতিক জীবন মুসোলিনির

অন্তরে একটা অতৃপ্ত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। জীবনের পূর্ণ স্বাদ গ্রহণ করার একটা বিপুল স্পৃহা তাঁকে চঞ্চল ক'রে তোলে। জীবনের সীমানা, সে কি শুধু এই বিদ্যালয়ের এই কয়েকজন ছাত্রকে নিয়ে থাকবে? মুসোলিনি এক বছর স্কুলমাষ্টারি করার পর একদিন অতৃপ্ত অন্তরে,—অন্তরে জাগ্রত চঞ্চল প্রাণ-দেবতার প্রেরণায় গ্রাম থেকে বেরিয়ে সুইজর্লোণ্ডের দিকে চল্‌লেন। পকেটে সামান্য অর্থ মাত্র সম্বল। সুইটজারল্যাণ্ডের সীমানায় এসে একটা কাগজে হঠাৎ দেখলেন যে তাঁর পিতা কারারুদ্ধ হয়েছেন। বেনিটোর মন চিন্তাকুল হয়ে উঠলো। এখন কি করা যায়? ফিরে যাব না এমনি যেখানে চলেছি সেইখানে যাব? আবার সেই শান্ত গ্রাম্যজীবন একঘেয়মীর সুরে বাঁধা, আর সামনে বিপুল জগত পড়ে রয়েছে অনন্ত সম্ভবনা নিয়ে! জীবনের পরিপূর্ণ পাত্র পূর্ণমাত্রায় পান করা চাই। বেনিটোর গ্রামে আর ফেরা হ'ল না। সে এগিয়ে চললো। ইটালীর ইতিহাসে একটি নূতন ধারার বীজ এইদিন যেন অলক্ষ্যে মূর্ত্তি গ্রহণ ক'রল। এমনি একটি মুহূর্ত্ত আর একবার আর একজনের জীবনে এসেছিল— সে—রুষো।

তারপর যে জীবন আরম্ভ হয় সে জীবন থেকে শেখবার বহু সামগ্রী আছে। অন্তরের প্রবল ইচ্ছা ও দৃঢ় শক্তি ও সাধনা যে জগতের সমস্ত বাধাকে তুচ্ছ করে একদিন মানবকে জয়যুক্ত ক'রে মুসোলিনির জীবনে আমরা তাস্পষ্ট দেখতে পাই। জগতের চিরন্তন ইতিহাসের পাতায় যারা আপনাদের অমর করে রেখে দিয়ে

গেছেন তাঁদের জীবনে দেখা যায়—সমস্ত ঘটনা যেন তাঁদেরি অধীনে। কোন ঘটনা কোনও দিন তাদের অসীম প্রকাশের শক্তিকে খর্ব্ব করতে পারেনি।

তখন মুসোলিনীর অর্থ ছিল না, কোন কাজ বা কর্ম্ম কিছুই ছিল না শুধু অন্তরে ছিল এক অদম্য বাসনা ও ইচ্ছা শক্তি। জেনাভাতে একরাত্রে যখন তিনি একটা পোলের তলায় শুয়ে রাত কাটাচ্ছিলেন তখন ভবঘুরে বলে পুলিশ তাঁকে ধরে নিয়ে যায়। এবং তিনি পথের ইট ও পাথর ভাঙবার কাজ পান। এই কাজ বর্ত্তমান ইউরোপের অনেক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে তাঁদের জীবনের কোন না কোন অংশে করতে হয়েছিল। কিন্তু এই সমস্ত কাজের মধ্যেও তাঁর লক্ষ ছিল কোন রকমে অবসর সময় ঠিক হাতে রাখা যে সময়ে তিনি এই উপার্জ্জিত অর্থ দিযে কোনও ইউনিভার্সিটির বক্তৃতা শুনতে পান ও তাঁর অধ্যয়ন চালান। এবং সত্যই সত্যই এই রকমে মুসোলিনী Wilfred Paretoর সামাজিকতত্ত্ব সম্বন্ধে সমস্ত বক্তৃতা শোনেন এবং Wilfred Paretoর অত্যন্ত প্রিয় হয়ে উঠেন।

এই সময়ে মুসোলিনীর জীবনে একটা ঘটনা ঘটে যাতে মুসোলিনীর তখনকার জীবনের দারুণ কষ্ট ও তাঁর চরিত্রের একটা বিশাল দিক স্পষ্ট ফুটে উঠে। একদিন শ্রান্ত দেহে, দুতিন দিন অনশনের পর অবশপদে তিনি ঘুরতে ঘুরতে একটা সুইস্‌গ্রামে আসেন। একটা বাড়ীতে দরজা খোলাছিল। সেই খোলা দরজা দিয়ে মুসোলিনী একটুকরো রুটীর জন্যে ভিক্ষা চাইলেন।

তখন তারা তাদের সামান্য খাবার নিয়ে খেতে বসেছিল। ছেলেরা ভিক্ষুকের বিশ্রী চেহারা ভয়ে কেঁদে উঠল। গৃহস্বামী এসে একটুক্রো রুটী ভিক্ষুকের হাতে দিল। ভিক্ষুক সেই রুটীর টুক্রো নিয়ে বনের দিকে এগিয়ে চল্ল। এমনি করে অপরের দ্বারে এই সামান্যতম করুণার ভিক্ষা চাইতে হল এই দারুণ ক্ষোভে তাঁর তেজী হৃদয় জ্বলে উঠল। সমস্ত হাত থর্ থর্ করে রাগে ও ক্ষোভে কাঁপতে লাগল। রুটীটা হাতে ধরে মাইল খানেক হেঁটে আসার পর আর থাকৃতে পারলেন না। দারুণ ক্ষুধায় দেহের সমস্ত রক্ত যেন জ্বলে বাষ্প হয়ে যাচ্ছিল। অবশেষে সেই রুটী থেকে একটুক্রো কামড়ে খেতে লাগলেন। তারপর হঠাৎ একটু খেতে না খেতে মুখ থেকে সমস্ত রুটী বার ক'রে হাতের রুটীটা সামনের নর্দ্দামায় ছুড়ে ফেলে দিয়ে গর্ব্বী ভিক্ষুক আবার রাত্রি অন্ধকারের পথ ধরল।

তারপরে যে সব ঘটনা ঘটতে থাকে তাতে বেনিটো ক্রমশঃ এক বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় জীবনের দিকে এগিয়ে চলেন। সুইজারল্যাণ্ডে নিম্নশ্রেণীর মজুর ও কুলীদের জীবনযাত্রার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মুসোলিনীর পরিচয় ঘটেছিল এই ভ্রমণের সময়। মুসোলিনি এই সব মজুর ও কুলীদের দলে মিশতেন এবং তাদের নিয়ে দল তৈরী করতেন এবং অনেক সময় এই সব দলে তিনি বক্তৃতাও দিতেন। কুলীদের মধ্যে ধর্ম্মঘট প্রচার করার দরুণ বেনিটোকে জেনেভার সীমানা থেকে বহিষ্কৃত করে দেওয়া হয়।

জোওরে নামে একজন বিখ্যাত ফরাসী নেতা সেই সময়

বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তাঁর মত সম্বন্ধে। সেই সভায় একজন সামান্য কুলী মজুরের মত একটী লোক সেই বক্তৃতা শুনছিল। জোওরের বক্তৃতার শেষে সেই লোকটী জোয়রেকে প্রতিবাদ করে এক বক্তৃতা করেন। সকলেই সেই কুলীর বক্তৃতায় বিস্মিত হয়েছিল। সে কুলী অবশ্য মুসেলিনী।

এই সময় সুইজারলাণ্ডে বেনিটোকে outlaw বলে প্রচারিত করা হয়। তার ফলে বেনিটোকে আবার ইটালীতে ফিরে আসতে হয়। এই সময় তিনি ফ্রেঞ্চ পড়িয়ে কিছু উপায় করতেন। অবশেষে পুলিষের উপদ্রব অত্যন্ত বেশী হওয়ায় বিরক্ত হয়ে মুসোলিনী ফ্রান্স Marsaille চলে যান। সেখানে একটা ধর্ম্মঘট সুন্দর ভাবে চালানর ফলে বেনিটো বেশ নামজাদা হয়ে উঠলেন বটে কিন্তু ফ্রান্স থেকেও নির্ব্বাসিত হলেন। অবশেষে তিনি ইটালীতে এসে সৈন্যবিভাগে যোগদান করেন।

১৯০৬ সালে মুসোলিনী একটী ভয়ানক আঘাত পান, তার মার মৃত্যু। বেনিটোর জননী তার জীবনে একটী প্রেরণার মত ছিলেন। বহু অবসাদ ও গ্লানির মধ্যে এই মাতৃমুর্ত্তি-ধ্যানে বেনিটো বহু বিষাদ হতে আপনাকে মুক্ত করিবার শক্তি সংগ্রহ করেছেন। মাতার মৃত্যুতে মুসোলিনীর ভয়ানক পীড়া হয়। ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য ট্রেনটো প্রদেশে যান এবং সেখানে কোনও কাগজে সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করেন। ট্রেনটো প্রদেশ অষ্ট্রীয়ার কিন্তু অষ্ট্রীয়ার বিপক্ষে লেখার দরুণ বেনিটো

এখানথেকেও বিতাড়িত হ'য়ে রোমানায় ফিরে এসে একখানি সোসিয়ালিষ্ট কাগজ বার করেন।

এই সময় মুসোলিনী বিবাহ করেন। এক বৎসর পরে তার একটী কন্যা হয়। এই সময়কার জীবন একটু শান্ত ভাবে কাটে। ভাওলিন বাজিয়ে এবং অনবরত বই এর পর বই গলধঃরণ করে স্বেচ্ছায়ে জীবন কাটে। এই সময়ে মুসোলিনি বলেছিলেন, "আমার জীবনের পাতায় স্পষ্ট অক্ষরে লেখা আছে তিনটী কথা— অধ্যয়ন, দুঃখ, আর সংগ্রাম।

যদিও মুসোলিনী একজন সাম্যবাদী ছিলেন তথাপি তিনি প্রয়োজন হলে ইটালীর এবং তাহার দলের অন্য সমস্ত সাম্যবাদীদের অত্যন্ত শান্ত নিরীহ প্রকৃতির লোক বল্‌তেন যারা সর্ব্বদাই আপোষের জন্য ব্যস্ত হয়ে আছে। মুসোলিনির কথায় বলতে গেলে তাদের প্রাণে বিশাল আবেগ ও মনে অসীম শক্তি ও তেজ ছিল না। কিন্তু এ সত্ত্বেও মুসোলিনী সাম্যবাদী দলের একজন বিশিষ্ট ও প্রিয় নেতা ছিলেন।

১৯১১ সালে ইটালী যখন টিপোলির জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করে তখন মুসোলিনী এই ঘোষণার বিরুদ্ধে লিখতে থাকেন। তাঁর মত ছিল যে ঔপনিবেশিক যুদ্ধের সময় দেখা উচিত যার জন্য যুদ্ধ করতে যাচ্ছি—যুদ্ধে ক্ষতির চেয়ে তার প্রাপ্তি বেশী লাভজনক কি না কিন্তু তখন যুদ্ধের বিরুদ্ধে এই আন্দোলনের জন্য তাকে বন্দী করা হয় এবং তিনি কারারুদ্ধ হন। কারাগারে যাবার সময় তিনি হাসতে হাসতে বলেছিলেন, অনেক দিন পরে আবার বিশ্রাম

করবার ও পড়বার সময় পেলাম।" এবং সত্য সত্যই এই কারাগারেই তিনি একখানি ইতিহাস রচনা করেন।

কারাগার থেকে ফিরে এসে তিনি সাম্যবাদীদের মুখপত্র "আভান্তি" avanti" পত্রিকার সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন এবং অতি দক্ষতার সঙ্গে তা পরিচালনা করেন। এই সময়ে তিনি সাম্যবাদীদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নেতা হয়ে উঠেন। শ্রমজীবিদের শিক্ষার জন্য প্রাণপাত করতে লাগলেন।

কিন্তু এইবার মুসোলিনীর জীবনে আর একটী বৃহত্তর ঘটনা ঘটে। ১৯১৪ সালে ইউরোপে যখন মহাসমর আরম্ভ হল তখন ইটালী মিত্রশক্তির সঙ্গে যুদ্ধে যোগদান করে। ইটালীর তদানন্তীন সাম্যবাদীরা কিন্তু এর বিরুদ্ধে ছিল। আর এই সাম্যবাদীদের নেতা বলতে গেলে স্বয়ং মুসোলিনি। কিন্তু মুসোলিনি ইটালীর যুদ্ধে যোগদানের পক্ষপাতী হলেন। মেলান্তেতা প্রমুখ সমস্ত সাম্যবাদীরা বিস্মিত ও মুসোলিণী প্রতি ক্রুদ্ধহয়ে উঠলেন! মুসোলিনির মত হল যে ইটালীর প্রাচীন বীর আত্মাকে জাগ্রত করতে হবে। এই দুর্ব্বল জাতিকে জগতের জাতির মহাসভায় তুলতে হবে। কিন্তু ১৯১৪ সালে অক্টোবর মাসে সাম্যবাদীর মুসোলিনিকে বিচারার্থ অহ্বান করে মিলানে এক সভা আহ্বান করেন। যখন মুসোলিনি সেই সভায় ঢুকেন তখন চারিদিক থেকে হাততালি, ব্যঙ্গকৌতুক ও ঘৃণার শব্দ হতে লাগল। কেউ কেউ মৃত্যুভয় দেখিয়ে চেঁচিয়ে উঠল। যখন মুসোলিনি বক্তৃতা দেবার জন্য মঞ্চে উঠলেন কেউ মুসোলিনির কথায় কান দেয় না।

চীৎকার আর অপমান করে তাকে দল থেকে বহিষ্কৃত করে দিতে চায়। তখন তেজস্বী বেনিটো মুসোলিনি একটা কাঁচের গ্লাস নিয়ে সশব্দে সেটা টেবিলের উপর চেপে ভাঙলেন। হাত দিয়ে রক্ত পড়তে লাগল। সেই রক্তঝরা হাত তুলে মুসোলিনি সভাকে আহ্বান করলেন। সভা স্তম্ভিত হয়ে গেল। তখন মুসোলিনি বললেন, "তোমরা আমায় আজ ঘৃণা করছ হীন ঈর্ষার বশে কারণ জনসঙ্ঘ আমাকে ভালবাসে। আজ তোমরা আমাকে হাততালি দিয়ে দল থেকে বার করে দিলে কিন্তু এমন দিন আসবে যখন আমিই সমস্ত জনসমুদ্রের নেতা হয়ে তোমাদের দেশ থেকে বহিষ্কৃত করে দেব।"

সেই থেকে তিনি আভান্তিয় সম্পাদকতা ছেড়ে দেন এবং Il Popolo d'Italia" বার করেন নিজে। কিন্তু অর্থাভাবে এই কাগজ বার করতে মুসোলিনির ভয়ানক কষ্ট পেতে হত। এই কাগজ বার করবার সময় তাঁর ভাই প্রাণ দিয়ে মুসোলিনির সাহায্য করেন। এই Il Popolo d'Italiaর লেখার জোরেই ইটালীর সমস্ত দিক থেকে দলে দলে লোক এসে জুটতে লাগল মুসোলিনির চারিদিকে অসংখ্য দল ও ও যুবক মুসোলিনিকে পূজ্য নেতা হিসাবে গ্রহণ করল।

১৯১৫সালে মে মাসে ইটালী যখন যুদ্ধে যোগদান করে তখন মুসোলিনি স্বয়ং এই যুদ্ধে সৈনিক হয়ে যোগদান করতে যান। কিন্তু প্রাচীন সৈন্যাধ্যক্ষরা মুসোলিনিকে বিপ্লববাদী মনে করে যুদ্ধে যোগদান করতে দেন নি কিন্তু তিনি অবশেষে বহুকষ্টে যোগদান করেন।

মুসোলিনী ও জাতীয়তা

যুদ্ধে মুসোলিনি অসীম সাহসী যোদ্ধা হয়ে উঠলেন এবং যেখানে তিনি থাকতেন সেইখানেই সৈন্যরা উত্তেজনার অভাব পেত না। সমস্ত সৈন্যদল তাঁর বন্ধু হ'য়ে উঠল। অবশেষে তিনি করপোরালের পদে উন্নত হন। একদিন যুদ্ধের সময় একটা গোলা এসে তাঁর পায়ে লাগে এবং তাতে তিনি সাংঘাতিক রকমে আহত হন অবশেষে আহত অবস্থায় তাকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে ফিরে আসতে হয় এই সমস্ত অল্প সংখ্যেক লোক নিয়েই প্রথমে ফ্যাসিস্তি দলের অভ্যুদয় হয়। এবং দলের সকলেই ছিল যুবক। তারা যেন আর কিছু বুঝতো না শুধু ইতালী থেকে বোলশোভিকদের তাড়াতে হবে। তারপর রাজ্যভার আপনাদের হাতে নিয়ে ইতালীকে নূতন করে নির্ম্মম ভাবে ভেঙ্গে একটা শক্তিশালী জাতিতে পরিণত করতে হবে।

মুসোলিনীর ব্যক্তিত্বে ও বক্তৃতায় দেখতে দেখতে দলে দলে লোক ফ্যাসিষ্টি দলের অন্তর্ভূক্ত হতে লাগল। ক্রমশঃ ইতালীতে বিদ্রোহের রক্ত মূর্ত্তি জেগে উঠল। প্রকাশ্য দিবা লোকে রক্তে ইতালীর রাস্তা লাল হয়ে উঠল।

ফ্যাসিষ্টিরা প্রচার করতে লাগল যে যখন প্রচলিত মন্ত্রীসভা শ্রমজীবিদের হাত থেকে দেশবাসীদের রক্ষা করতে অক্ষম তখন তারা পদত্যাগ করুক এবং ক্রমশঃ ফাসিষ্টিরা প্রকাশ্যভাবে মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে কাজ করতে লাগলো। ক্রমশঃ প্রকাশ্য রাজপথে ফাসিষ্টি দলের সঙ্গে সাম্যবাদীদের দাঙ্গা হাঙ্গামা অরম্ভ হল। এধারে গভর্ণমেণ্ট শান্তিরক্ষা করতে অসমর্থ হ'য়ে উঠলো। বিপদ

দেখে ফ্যাক্টা মন্ত্রীসভা ত্যাগ করেন। কেহই আর মন্ত্রীসভা পুনর্গঠন না করায় ফ্যাক্টা আবার মন্ত্রীসভা গঠন করেন। ফাসিষ্টি দলকে এই মন্ত্রীসভা বিশ্বাস করতে পারল না। ফাসিষ্টিদের সঙ্গে ক্রমশঃ মন্ত্রীসভার বাদানুবাদ চলতে লাগলো। মুসোলিনি বলেন যে এই মন্ত্রীসভা যদি সাম্যবাদীদের সঙ্গে যোগদান করে ত তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করবেন। ফ্যাক্টা উত্তর দিল, "দেশের মঙ্গলের জন্য, ফাসিষ্টি সম্প্রদায় উচ্ছেদ যদি বলপ্রয়োগ প্রয়োজন হয় তাহাতেও কুণ্ঠীত হব না।"

যখন এইরকম বাদানুবাদ চলছিল তখন আর একটী গণতান্ত্রিকদল শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। জিওলিত্তি এই দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করে মন্ত্রীসভা গঠন করবার আহ্বান পায় কিন্তু জিওলিত্তি ফ্যাসিষ্টি সম্প্রদায়ের ঘোরতর শত্রু। তাই দেখে মুসোলিনি মিলান সহর থেকে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন, এবং দলের সকলকে আহ্বান করে এক সভায় প্রচার করলেন দেশের শাসনভার তাঁরা নেবেন। ফ্যাক্টা এই সমস্ত দেখে সামরিক আইন জারী করতে চান কিন্তু ইতালীর সম্রাট দেখলেন ফ্যাসিষ্টীদের সঙ্গে সৈন্যদের যোগ আছে। কাজেই তখন মুসোলিনিকে মন্ত্রীসভা গঠন করবার জন্য আহ্বান করা হল। মুসোলিনী বিজয়ী সিজারের মত রোমে প্রবেশ করলেন এবং রোমবাসী তাঁকে বিপুল অভ্যর্থনা দিয়েছিল। ইটালীতে ফ্যাসিষ্টী অন্দোলন এই রকমে জয়যুক্ত হয়। নগরবাসীদের বিপুল অভ্যর্থনার উত্তরে মুসোলিনি বলেছিলেন, "রোমের অধিবাসিবৃন্দ, তোমরা অল্পকাল পরেই দুর্ব্বল মন্ত্রীসভার স্থানে

প্রাণময় সবল মন্ত্রীসভা পাবে। ইতালী নব যৌবনে জাগুক। ফ্যাসিষ্টী সম্প্রদায়ের মন্ত্র অক্ষয় হ'ক।"

ফ্যাসিষ্ট আন্দোলনের জয় হ'ল কিন্তু আদর্শবাদী মুসোলিনি দেখলেন যে ইটালীর কোনে কোনে আলস্য, জড়তা ও একটা ঝিমান-ভাব জমা হ'য়ে রয়েছে। জাতিকে সবল করতে হ'লে এ সমস্ত দূর করা চাই ; এবং একাজে কঠোরতারও প্রয়োজন আছে। ইটালীর আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হ'য়ে উঠেছিল। মুসোলিনির নজর সে দিকেও পড়ে। তিনি অহরহ প্রচার করতে লাগলেন, কাজ—কাজ—কাজ।" তাঁর মূলমন্ত্র হল, "নিয়মনিষ্ঠা, আত্মত্যাগ আর কর্ম্মে অনুরাগ।" ফ্যাসিসম্ ধনী ও শ্রমিকদের পার্থক্য যে একেবারে চলে যাবে তা' বলে না তবে বলে যে তাদের সম্বন্ধ যাতে মধুর হয় তার দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। সামাজিক বৈষম্য থাকবে কিন্তু এই বৈষম্যজনিত যত সব ঘৃণ্য ও পীড়নকারি জিনিষের সৃষ্টি হয়েছে তা'কে দূর করতে হবে। রাষ্ট্রশক্তি যে সম্পূর্ণ ভাবে জনসাধারণের হাতে থাকবে তা' মুসোলিনি চান না —তবে প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনের সম্পূর্ণ ক্ষমতা সমগ্র জনসাধারণের থাকবে।

মুসোলিনি ঘোরতর আদর্শবাদী। ইতালীর অতীত গৌরব তাঁকে ও তাঁর সমসাময়িক বিশ্ববিশ্রুত ডানন্জিওকে ঘিরে আছে—তাঁদের অন্তরের চিরন্তন প্রেরণা হয়ে। দুজনেই অদ্ভূতকর্ম্মা। মুসোলিনি সিংহশাবক পোষেন। মানুষের মাথার খুলির কঙ্কাল তার মসী-আধার। কাগজচাপা দেবার জন্য টেবিল

একটা ছোরা থাকে। মাঝে মাঝে তিনি পশুশালায় গিয়ে সিংহদের ঘরের মধ্যে গিয়ে সিংহদের আদর করেন। এই লোক এখন ইটালীর ভাগ্যবিধাতা।



কামাল পাশা

কামালপাশা ও নবীন তুরস্ক

কামালপাশার জীবনীর বিষয় বলিতে হইলে আগাগোড়াই একটা মস্ত বড় সমস্যার সম্মুখে আসিতে হয়। সে সমস্যাকে এক কথায় সামাজিক বিদ্রোহ বলা যাইতে পারে। কামাল-পাশার জীবনের কথা বলিতে যাইলেই এই সামাজিক বিদ্রোহের সমস্যা মনের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে।

বাহিরের পরাধীনতা একটা জাতির পক্ষে ততটা অকল্যাণের নয়—যতটা বেশী অকল্যাণের জাতির অন্তরের পরাধীনতা ও নির্বীর্য্যতা। ইতিহাস বহুবার ইহার সপক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছে। এমন কোনও জাতি বোধ হয় জগতে নাই—যাহার জীবনে সে কখনও পরাধীনতার অভিশাপ অর্জ্জন করে নাই। একজাতি

শতাব্দীর সূর্য্য

শতাব্দী কাল আর একজাতির উপর আধিপত্য করিল—আবার সে জাতি পূর্ণ উদ্যমে জাগিয়া উঠিল। ইহার ক্রমান্বয় ধারা লইয়াই ইতিহাস সৃষ্টি হইয়া আসিতেছে। ইতিহাসের জগতে ইহাকে জাতির সাময়িক অকল্যাণ হিসাবে ধরা যাইতে পারে—জাতির আত্মার অকল্যাণের সঙ্গে ইহার কোনও স্থায়ী যোগ নাই।

কিন্তু বাহিরের রাজনৈতিক পরাধীনতার চেয়ে জাতির সব চেয়ে বেশী অকল্যাণের বস্তু হইতেছে—তাহার আপন অন্তরের পরাধীনতা। সেখানে যে শৃঙ্খল বাজে—তাহার শব্দ বড় নিষ্করুণ বড় মমতাহীন। অন্তরের অন্তঃস্থলে বসিয়া যক্ষ্মা রোগের বীজাণুর মত নিঃশব্দে রক্তকোষ শূন্য করিয়া দেয়; তারপর অর্দ্ধ-রাত্রের অন্ধকারে সহসা হৃদ্‌যন্ত্র থামিয়া যায়। রক্ত চলাচল বন্ধ হইয়া আসে—নিরুপায় রোগী অসহায় ভাবে মৃত্যুর কাছে আত্ম-সমর্পণ করে।

জাতির এই আত্মিক মৃত্যু জাতির পক্ষে চরম দুর্দ্দৈবের বিষয়। এই মৃত্যুর বীজ যক্ষ্মার বীজের মতই প্রতারক। এই বীজ এমন পথ আশ্রয় করিয়া আসে—যে তাহার আগমন যে অকল্যাণ সাধারণ লোক তাহা ভাবিয়া উঠিতে পারে না; যক্ষ্মা রুগী যেমন মৃত্যুর শেষ পর্য্যন্ত বিশ্বাস করে যে সে বাঁচিয়া উঠিবে —তাহার কিছুই হয় নাই।

সোজা কথায় বলিতে হইলে বলিতে হয় যে জাতির যে সমস্ত অনুষ্ঠান, আচার-ব্যবহার, ধর্ম্ম-পদ্ধতি ও বিশ্বাস জাতির অন্তরের

অত্যন্ত প্রিয়-ধন, জাতির আত্মিক মৃত্যুর বীজ তাহাদের অন্তরালেই আসিয়া থাকে। মানুষ বুঝিতে পারে না—আবরণকে সে এত-খানি শ্রদ্ধা করে যে তাহার অন্তরালে যে শত্রু থাকিতে পারে, সে তাহা কিছুতেই বুঝিতে চায় না। বুঝিলেও বিপদ, শত্রুকে আঘাত করিতে হইলে সে যে আবরণের পিছনে আসিয়াছে—তাহাতেই প্রথম আঘাত লাগে। অথচ সে বস্তু জাতির হয়ত যুগ-যুগান্তের পুণ্য-ফল।

ধর্ম্মের লৌকিক অস্তিত্ব মানুষের প্রতিদিনের আচারে, ব্যবহারে, তাহার শিক্ষা-দীক্ষার মধ্যে। মানুষ যখন আপনার মনকে অশিক্ষা ও কুসংস্কারে সঙ্কীর্ণ করিয়া আনে—তখন আপনার মনের সঙ্কীর্ণতার সহিত সে তাহার শাশ্বত ধর্ম্মকেও সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলে। মিথ্যার ও অশিক্ষার অহমিকা তখন তাহার ধর্ম্মের চারিদিকে বেড়ার সৃষ্টি করে এবং আপনিও সেই বেড়ার মধ্যে বন্দী হইয়া থাকে। ধর্ম্ম তখন জীবনকে গতি না দিয়া—দেয় এক নিশ্চল স্থাণুতা—বুদ্ধিকে পরিশুদ্ধ না করিয়া, তাহাকে সীমাবদ্ধ ও পঙ্কিল করিয়া তোলে। ধর্ম্ম মরিয়া যায়—আচার ও অনুষ্ঠানের মিথ্যা অহমিকা সত্যের মুখোস পরিয়া বেড়ায়। মানুষ তাহারই সেবা করিয়া—আপনার ও তাহার সঙ্গে জাতিরও মৃত্যু আনে। দেহের মৃত্যুই তো একমাত্র মৃত্যু নয়—নির্বীর্য্যতাই মৃত্যু। ধর্ম্মে, সমাজে, সাহিত্যে এই উপায়েই মৃত্যু আসে। এবং যে জাতির মধ্যে এই মৃত্যুর ছায়া আসিয়া পড়ে—তাহার মত হতভাগ্য জাতি পৃথিবীতে নাই।* আজ ভারতের সব চেয়ে বড়

সমস্যা কেমন করিয়া এই আত্মিক মৃত্যুর নিষ্ঠুর হইতে সে বাঁচিবে। পুরুভুজের বাহুর মত মৃত্যুর বীজ আজ ভারতের সর্ব্বাঙ্গ আঁকড়িয়া আছে। ইংরাজের রাজনীতির চেয়ে সে ঢের বড় শত্রু।

এই একই সমস্যা তুরস্কের প্রাণদাতা কামালপাশাকে সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। কামালপাশার জীবনের সব চেয়ে বড় ঘটনা নয়—যে কতকগুলি তুর্কী সৈন্য লইয়া কেমন করিয়া তিনি গ্রীকদের তুরস্ক হইতে বিতাড়িত করিলেন, আমার মনে হয় তাঁহার জীবনের সব চেয়ে বড় ঘটনা হইতেছে—কেমন করিয়া, বা কতখানি তিনি জাতির পুরাতন ও সনাতন আচার-পদ্ধতিকে গ্রহণ করিবেন এবং যাহা জীর্ণ অথচ যাহা সনাতন তাহার সহিত নূতন যুগের কেমন করিয়া সামঞ্জস্য সাধন করিবেন। তাঁহার জীবন এই প্রচেষ্টায় আজও নিয়োজিত। এ বিচারের ভার ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকের—আজিকার নয়। কামালপাশার পক্ষে এই সমস্যা আরও বেশী গুরুতর—কেন না ইসলাম ধর্ম্ম ও তাহার ব্যবহারিক আচার-অনুষ্ঠান পরিবর্ত্তনের অপেক্ষা রাখে না। প্রত্যেক মুসলমান আপনার অন্তরের পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা দিয়া সম্পূর্ণ কোরাণকে অসংশয় চিত্তে অভ্রান্ত ও একমাত্র সত্য-পথ পরিচায়ক জ্ঞান করেন। এবং এতকাল ধরিয়া নানাভাবে ধর্ম্মের চারিদিকে যে সকল আচার-অনুষ্ঠান নানারূপ পরিগ্রহ করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে—সেগুলিও জাতির অধিকাংশের মনে বেশ একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। কাজে কাজেই কামাল-

পাশার জীবন ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকের কাছে একটা বিশেষ দামী জিনিষ এবং বর্ত্তমান জগতে তাঁহার জীবন সমাজ-শাস্ত্রের ছাত্রের একটা ঔৎসুক্যের বিষয়।

নীচে লোথ্রপ ষ্টডার্ড মহাশয় সাক্ষাৎভাবে কামালপাশার সহিত মিশিয়া তাঁহার জীবন ও ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন—তাহাই দিলাম। কেননা তুর্কীর সমস্যার বিষয়ে আজ সমগ্র য়ুরোপে লোথ্রপ ষ্টডার্ডের মত অভিজ্ঞ ব্যক্তি নাই বলিলেই চলে।

"মোস্তাফা কামাল পাশা আধুনিক যুগের এক জন অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। প্রাচীন রূপকথার সহসা জাগরণের মত, সমস্ত বিশ্বকে বিস্মিত করিয়া নবীন তুরস্ক জাগিয়া উঠিতেছে। আর এই নবজাগরণের প্রতীক কামাল পাশা।

সম্প্রতি তুরস্ক ভ্রমণ-কালে আমার সৌভাগ্যবশতঃ কামাল-পাশার সহিত সাক্ষাৎ হয়। এশিয়া মাইনরের অন্তরস্থল, রাজধানী আঙ্গোরা সহরে আমি বহুকাল থাকিয়া দেখিয়া আসিয়াছি—একটী জাতি জাগিতেছে আর এক জন লোক সমস্ত প্রাণমন উৎসর্গ করিয়া সেই জাগরণের স্বপ্নকে সফল করিয়া তুলিতেছে।

কামাল পাশার সহিত আমার প্রথম দর্শন আমার মনে স্পষ্টাক্ষরে লেখা রহিয়াছে। সে দিন তুরস্কের নব পার্লিয়ামেণ্ট—গ্র্যাণ্ড ন্যাশন্যাল এসেম্ব্লীর অধিবেশন দিবস। গ্র্যাণ্ড ন্যাশন্যাল এসেমব্লীর নামটী শুনিতে খুব গম্ভীর বটে, কিন্তু আসলে ইহার চারি পাশ একেবারে আড়ম্বরহীন। আঙ্গোরা শহরটীও ইয়ো-

য়োপের অন্যান্য রাজধানী হইতে নিতান্ত আড়ম্বরহীন এবং পার্লিয়ামেণ্ট গৃহটী ও এই আড়ম্বরহীনতার সহিত মাপ দিয়া তৈয়ারী, গৃহটীর সামান্য আয়তন, লাল টালীদিয়ে ছাওয়া ছাদ, ছাদের উপরে তুরস্কের জাতীয় পতাকা।

জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা হইবার পূর্ব্বে এই গৃহ পূর্ব্বতন রাজপুরুষদের একটী আড্ডাস্থল ছিল। গৃহের ভিতরেও সেই একই আড়ম্বরহীনতা। হলের সামনে প্লাটফর্ম্মে সভাপতির আসন—দুই ধারে দর্শকদের গ্যালারী—মধ্যস্থলে বেঞ্চ পাতা। এক একটী বেঞ্চে দুই জন করিয়া বসিয়া থাকেন। তুরস্কের পার্লামেণ্ট গৃহের এই সাজ-সজ্জা। এই সজ্জাহীন কক্ষে তুরস্কের নবীন কর্ম্ম-জীবনের ধারা জাগিয়া উঠে,—জাতির মর্ম্মস্থলে যে রক্ত বহে, তাহার ছন্দ এইখানের সহজ সরলতার মধ্যে জন্মগ্রহণ করে।

আমি যখন হলে প্রবেশ করি, কামাল পাশা তখনও আসিয়া পৌছান নাই। নবাগতের বিস্মিত দৃষ্টি লইয়া চারিদিক পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলাম। মনে মনে ভাবিতেছিলাম কামাল-পাশার প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই নিশ্চয়ই তুমুল অভিবাদন হইবে, কিংবা কোনও প্রাচ্যসুলভ অভিনব আয়োজন আছে। কখন নিশব্দে কামাল পাশা প্রবেশ করিলেন—অভিবাদন নাই আয়োজনও নাই। একেবারে আমার সম্মুখে আসিয়া বসিলেন।

এত নিকটে বসিয়া কামাল পাশার দিকে চাহিয়া দেখিলাম—দেখিয়া মনে হইল বিধাতার বিশিষ্ট ছাপ সর্ব্বাঙ্গে লেখা রহিয়াছে। মুখের ও চোখের সে দৃঢ় ভঙ্গী জীবনে ভুলিব না। সহসা কামাল

পাশার হাতের দিকে নজর পড়িতেই দেখি সমস্ত হাতের গঠনের মধ্যে একটা এমন বিশেষত্ব আছে যাহা আর কোথাও দেখি নাই। সুডোল মসৃণ, মনে হয় কোমল অথচ কি প্রশস্ত ও বর্ণময়। হাতের ভঙ্গীও অপূর্ব্ব। খুব ধীরে ধীরে সঞ্চালন করেন, কিন্তু প্রত্যেক সঞ্চালনের সঙ্গে মনে হয় মন মুগ্ধ হইয়া পড়িতেছে। অন্যান্য বিবরণ দিবার আগে মনে হয় এইস্থানে এই অদ্ভুতকর্ম্মা পুরুষটীর জীবনী সম্বন্ধে একটু সামান্য বিবরণ দেওয়া প্রয়োজনীয়।

চল্লিশ বৎসর আগে সালোনিকা শহরে মোস্তাফা কামাল-পাশা জন্মগ্রহণ করেন। সেই সময় ১৯১২—১৩ সালের বল্কান্ যুদ্ধের ফলে সালোনিকা গ্রীসের অধীনে ছিল।

কামালপাশার পিতা সামান্য চাকরী করিতেন এবং তাঁহার যে বিশেষ কোনও প্রতিভা বা কর্ম্ম-শক্তি ছিল, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। কামালপাশা তাঁহার চরিত্রের সমস্ত বিশেষত্ব ও শক্তি তাঁহার মাতার নিকট হইতে পান। অতি অল্প বয়সেই কামাল পাশার পিতৃবিয়োগ ঘটে এবং তাহার ফলে নিতান্ত অর্থাভাবে কামালের সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়। কামালের জননী আলবিয়ান দেশের মেয়ে এবং আলবিয়ান দেশের রূপ ও গুণের বিশেষত্বগুলি কামালের মধ্যে পরিপূর্ণ মাত্রায় আছে। যে অসীম উদ্যম ও কর্ম্মশক্তির বলে আজ কামাল নূতন করিয়া জাতিকে গড়িয়া তুলিতেছেন, সে উদ্যম সে শক্তি তিনি জন্মের সহিত লইয়া আসেন।

কামালের ভবিষ্যৎ জীবনের ধারা কিশোর কালেই পরিস্ফুট হইয়া উঠে। এই সময় তিনি সামরিক বিদ্যালয়ের ছাত্র হিসাবে প্রবেশ করেন এবং কয়েক বৎসর যাইতে না যাইতেই তিনি সেখানকার এক জন পদস্থ কর্ম্মচারী হন। সামরিক বিদ্যায় যথেষ্ট পারদর্শী হইলেও চাকুরীর উন্নতির দিক দিয়া তিনি বড় একটা কিছু করিতে পারেন নাই। তাঁহার রাজনৈতিক মতের জন্য তাঁহার উচ্চ পদের আশা ত্যাগ করিতে হয়। কামালপাশার যৌবন জাগে সুলতান আবদুল হামিদের কঠোর রাজশাসনের মধ্যে।

সেই সময় তুরস্কের অভ্যন্তরে কয়েক জন যুবকের মনে দেশের আভ্যন্তরিক অবস্থা দেখিয়া প্রচলিত রাজশাসনের বিরুদ্ধে অশ্রদ্ধা জাগিতে থাকে। কামাল পাশা ছিলেন সেই সমস্ত যুবকদেরই অন্তর্ভুক্ত। দেশকে অবনতির সহস্র মরণ-বন্ধন হইতে কি উপায়ে উদ্ধার করা যায়, সেই চিন্তায় তাঁহার যৌবন-মন ভোর হইয়া থাকে! যদিও কামাল বাহিরের দিক হইতে বেশ শান্ত জীবন যাপন করিতেছিলেন, কিন্তু কিছু দিন যাইতে না যাইতেই কামালের গোপন গতি-বিধির কথা সুলতানের গুপ্তচরের কানে গিয়া উঠিল এবং অচিরেই কামালপাশার নামের আগে একটী বিশেষণ জোড়া হইয়া গেল—ভয়ানক। এই বিশেষণে সবিশেষ ভাবে বিভূষিত করিয়া কামালপাশাকে রাজ্যের একেবারে উপান্ত প্রদেশে রাজ-নিয়োগে পাঠাইয়া দেওয়া হয় এবং বৎসরের মধ্যে বহু চেষ্টা করিয়া কোনও ক্রমে এক আধ খানা চিঠি তাঁহার হস্তগত হইত।

এই সময়ের মধ্যে কামালের জন্মভূমি সালোনিকাতে যুদ্ধ-মন্ত্রে দীক্ষিত নবীন তুরস্কেরা গুপ্ত-সমিতি করিয়া বিদ্রোহ ঘনাইয়া আনিতেছিল এবং এই "নবীন তুরস্ক" দলই ১৯০৮ সালে আবদুল হামিদকে সিংহাসনচ্যুত করে। যদিও এক সময় কামালপাশা এই দলের এক জন বিশিষ্ট নেতা ছিলেন, কিন্তু বহু দিন দূরে অবস্থান করার ফলে এই দলের শক্তির সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। কিন্তু কামাল সামরিক বিভাগেই কাজ করিতে লাগিলেন এবং ১৯১৪ সালের যুদ্ধ আরম্ভ হইবার অব্যবহিত মুহূর্ত্তে তিনি সামরিক বিভাগের একজন উচ্চ-পদস্থ কর্ণেল ছিলেন।

১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধের ফলে কামালের সহিত তদানীন্তন তুরস্ক গভর্ণমেণ্টের আবার মনোমালিন্য দেখা দিল। তুরস্কের শাসন-প্রণালীর হর্ত্তা-কর্ত্তা বিধাতা তখন আনওয়ার পাশা। তিনি ছিলেন জার্ম্মাণ জাতির পক্ষপাতী এবং তাহার ফলে তুরস্ক মহাযুদ্ধে বৃটীশের মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে জার্ম্মাণীর পক্ষে যোগদান করেন। কামালপাশা কিন্তু জার্ম্মাণদের সহিত মিলনের বিপক্ষে দাঁড়ান এবং তাহার ফলে তদানন্তীন গবর্ণমেণ্টের সহিত কামালের বিশেষ মনোমালিন্য ঘটে। আনওয়ার পাশা জানিতেন যে, কামাল পাশার ন্যায় বীর সৈনিকের একান্ত প্রয়োজন, অথচ রাজধানীতে তাহাকে রাখা নিরাপদ নয়। এই সমস্ত ভাবিয়া আনওয়ার পাশা কামালকে রাজধানী কনষ্টাণ্টীনোপল হইতে দূরে দার্দ্দানালিসে প্রেরণ

করেন। দার্দ্দানালিসে প্রথম কামালপাশা সমস্ত ইয়োরোপের সম্মুখে আপনার অসামান্য সামরিক দক্ষতার ও বিচার-বুদ্ধির পরিচয় দেন। কামালের বিচার-বুদ্ধি ও সামরিক দক্ষতার ফলেই দার্দ্দানালিসে বৃটীশ সৈন্যরা ব্যাহত হইয়া ফিরিয়া যায়। কিন্তু কামালের এই বীরত্বের কথা তুরস্ক গভর্ণমেণ্ট চাপিয়া রাখেন এবং তাহার ফলে সাধারণ লোক কামালের বীরত্ব সম্বন্ধে তখনও অজ্ঞ ছিল। তুরস্কের গভর্ণমেণ্ট কামালপাশাকে সংগ্রাম ও লোকালয় হইতে আরও দূরে তুরস্কের উপান্ত প্রদেশে প্রেরণ করে। কিন্তু মেসোপটেমিয়া ও সিরিয়ার প্রান্তদেশেও এই তরুণ বীর আপনার বীরত্বের ফলে বার বার তুরস্ককে বাঁচায়।

যুদ্ধের আরম্ভ হইতেই কামাল ভবিষ্যৎ ফলাফলের বিষয় সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া এই মহাযুদ্ধের বিপক্ষে দাঁড়ান। যুদ্ধ শেষ হইয়া গেলে দেখা গেল যে, কামালের ভবিষ্যৎ-বাণীই সত্য হইয়া উঠিয়াছে। মহাযুদ্ধেব পরিণামে এক মৃত্যুময় অবসাদ সমস্ত জাতিকে পাইয়া বসিল। দেশের চারি দিকে এক আশাহীন ভয়াবহ রূপ। রক্তশূন্য হইয়া পাংশুদেহে তুরস্ক যেন ইয়োরোপের দ্বারপ্রান্তে মৃত্যুশ্বাস টানিতেছিল। জাতির সমস্ত লোক ও ধনবল ফুরাইয়া আসিয়াছে। বৃটীশের মিলিত শক্তি জয়দৃপ্ত হইয়া তুরস্কের রাজধানী আগলাইয়া বসিল এবং তুরস্কের অন্যান্য প্রদেশ সৈন্য দিয়া ঘিরিয়া রাখিল। শুধু এশিয়া মাইনরের অন্তস্থল আনাটোলিয়া এই

বিজিত জাতির সৈন্যদের পাহারার হাত হইতে নিস্তার পায়।

আনওয়ার পাশার অধীনস্থ নূতন তুরস্ক দল ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে এবং স্বয়ং আনওয়ার পাশা ও অন্যান্য নেতারা জেতাদের প্রতিহিংসার হাত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য নাগরিক জীবন হইতে গোপনে সরিয়া পড়িলেন। মিলিত মিত্র-শক্তি এই ব্যাপার দেখিয়া নূতন গভর্ণমেণ্টকে আপনাদের হস্তগত করিয়া লইলেন।

তখন এশিয়া মাইনরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে ছত্রভঙ্গ সৈন্যদল ছোটখাট দল বাধিয়া পেটের দায়ে দস্যুবৃত্তি আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল।

মিত্র-শক্তিরা যদি তুর্কীর সহিত শান্তির একটা ন্যায্য ব্যবস্থা করিত, তাহা হইলে হয় ত কামাল এশিয়া মাইনরের ছত্রভঙ্গ সেনাদলকে বশে আনিয়া ফিরিয়া আসিতে পারিতেন। কিন্তু সেই সময়ে মিত্রশক্তির ব্যবহারে তুরস্কবাসীদের মনে সন্দেহের শিখা জ্বলিয়া উঠিতেছিল। তুর্কীকে পদানত করিয়া মিত্র-শক্তিরা ক্রমশঃ আপনাদের স্বরূপ ও উদ্দেশ্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং তখন ইয়োরোপের যে কোনও রাজনীতিক বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে মিত্র-শক্তির এইসব প্রচেষ্টা সফল হওয়ার অর্থ ইয়োরোপের মানচিত্র হইতে স্বাধীন তুর্কীর অন্তর্দ্ধান। ইহাই শুধু নয়, তুর্কীর আত্মসম্মানে আরও বেশী ঘা লাগে যখন স্থানীয় খৃষ্টানদের দখলে আনাটোলিয়ার

অধিকাংশ স্থল গিয়া পড়ে। এশিয়া মাইনরের পূর্ব্বে আর্ম্মেনিয়ান ও পশ্চিমে গ্রীকদের মধ্যে আনাটোলিয়া যেন ভাগ বাটোয়ারা হইয়া গেল। এই অপমানে সমস্ত তুর্কীর অন্তরে বাড়বানল জ্বলিয়া উঠিল। হাজার বছর ধরিয়া যাহারা জয়ের মুক্তগান গাহিয়া আসিয়াছে এবং পৃথিবীর অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সভ্যতার উত্তরাধিকারী—তাহারা কিনা আজ তাহাদেরই দাসের দাস হইয়া থাকিবে; মৃত্যু যে এর চেয়ে শ্রেয়ঃ! দেখিতে দেখিতে তুরস্কের চারি দিকে প্রতি ঘরে বিদ্রোহের গুঞ্জন-ধ্বনি মর্ম্মরিত হইয়া উঠিল। মিত্র শক্তিরা তাহা বেশ বুঝিতে পারিল এবং বুঝিতে পারিয়া তাহার প্রতীকার করিতে গিয়া আরও একটী বিষম ভুল করিয়া বসিল। আনাটোলিয়া দখল করিবার মত সৈন্য তখন মজুত না থাকায় মিত্র শক্তিরা গ্রীকদের প্ররোচিত করিয়া তাহাদের দ্বারা স্মার্ণা আক্রমণ করাইলেন। ১৯১৯ সালের বসন্তকালে গ্রীক সৈন্যেরা সহসা স্মার্ণার উপর আসিয়া পড়িল—নিরীহ তুর্কীর রক্তে বসন্তের পৃথিবী রাঙা হইয়া উঠিল। গ্রীকরা বুঝাইয়া দিল গ্রীকশাসন কাহাকে বলে।

কিন্তু এই ঘটনা দেশের বিদ্রোহী মনে আগুন ধরাইয়া দিল। সহসা সমগ্র জাতি পরিবর্ত্তিত হইয়া এক উগ্র মূর্ত্তি ধরিয়া দাঁড়াইল। এক জনও তুর্কী বাঁচিয়া থাকিতে আনাটোলিয়া গ্রীসের অধীনে যাইতে পারে না। যুদ্ধে পরাজিত ও হতবল হইয়া তুর্কীরা কনস্টান্টিনোপল ইয়োরোপীয় শক্তিদের হাতে

ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিল ; তবে তাহাদের মনে আশা যে, আনাটোলিয়ার জন্মভূমিতে তাহারা আবার আপনাদের মৃত জাতীয়তাকে কোনও উপায়ে পুনরুজ্জীবিত করিয়া বাচিয়া থাকিবে—সেখানে মিত্রশক্তিরা তাহাদের বাধা দিবে না এবং মিত্রশক্তির প্রধান প্রধান নেতাগণ বিশেষত লয়েড জর্জ্জ বরাবরাই এই বিষয়ে ভরসা দিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু যখন তুর্কীরা বুঝিতে পারিল যে, এই সমস্ত শান্ত বচন শুধু যুদ্ধ রচনার নেপথ্য বিধান এবং তুর্কীকে গ্রাস করাই তাহাদের উদ্দেশ্য, তখন সমস্ত তুর্কী মরণোন্মাদ হইয়া উঠিল। কাহার সহিত লড়িতে হইবে—কি করিয়া লড়িতে হইবে—কিছুরই ঠিকানা নাই।

এই মরণ-পণ জীবন্ত মূর্ত্তি ধরিয়া উঠিল কামাল পাশার মধ্যে। তুর্কীর জাগরণের যে বাসনা সঙ্গোপনে কামাল বহু দিন অন্তরে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন—আপনার সামরিক প্রতিভার সাহায্যে বুঝিতে পারিলেন যে এই তাহার শুভ মুহূর্ত্ত আসিয়াছে। জাগিতে হইলে এখনি জাগিতে হইবে—নতুবা একেবারে চিরান্ধকারে থাকিতে হইবে। তখন দলে দলে গ্রীক্ সৈন্য আসিয়া স্মার্ণা ছাইয়া ফেলিতেছিল এবং আনোটোলিয়া আক্রমণ করিয়া দখল করিবার চেষ্টা করিতেছিল। বিলম্বের একটী মুহূর্ত্তও সময় ছিল না। কামাল আর কোনও বিচার-বিতর্ক না করিয়া আপনি যুদ্ধ-ঘোষণা করিয়া দিয়া নবীন তুরস্কের দ্বারে দ্বারে আবেদন-ধ্বনি পাঠাইলেন। দেশের জন্য কামালের পতাকার তলে নবীন তুরস্ক

আসিয়া দাঁড়াইল। জীবন-মরণ-পণকারী কামালকে তুর্কী জাতির নেতা বলিয়া তাহারা বরণ করিয়া লইল।

কামালের রসদ্ ও সৈন্য-শক্তি এত অল্প ছিল যে, এই যুদ্ধ-ঘোষণা বাতুলতার প্রমাণ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। গ্রীক্‌রা প্রথমে অনায়াসেই সামান্য অস্ত্রশস্ত্রে ভূষিত কামালের সৈন্যদের পরাজিত করিয়া আনাটোলিয়ার পশ্চিম ভাগ দখল করিয়া বসিল। এই নিদারুণ বিপদের সময় দুইটী বাহিরের জিনিষ তুর্কীকে বিশেষ সাহায্য করে। একটী আনাটোলিয়ার ভৌগলিক সংস্থান আর একটী মিত্রশক্তিদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব। এসিয়া মাইনরের বিরাট প্রান্তরে জন-সংখ্যা অত্যন্ত বিরল এবং পাহাড় ও মরুভূমির জন্য সেনা-চালন এখানে অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। আবার এ ধারে তখন মিত্রশক্তিদের মধ্যে তুর্কীর ভাগ বাটোয়ারা লইয়া অন্তর্কলহ দেখা দিয়াছে। প্রথমেই ইটালী ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের কাছ হইতে যে পাওয়ানা আশা করিয়াছিলেন, তাহাতে নিরাশ হইয়া তুর্কীর সমস্ত সংস্রব ছাড়িয়া দিল। এখন ফরাসী ও ইংলণ্ডে তুর্কীর ভোগ-দখল ব্যাপারে স্বার্থের টানাটানি পড়িল। ফরাসীরা দেখিল যে, ইংলণ্ড গ্রীকদের হাত করিয়া সমস্ত তুর্কী দখল করিতে চায়। তাহাদের স্বার্থে আঘাত পড়িল। ফরাসীরা তখন গোপনে তুর্কী নেতাদের সহিত গুপ্তভাবে মিলিয়া রসদ ও অস্ত্র সরবরাহ করিতে লাগিল। তার পর তিন বৎসর ধরিয়া দক্ষিণ ইয়োরোপের মধ্য দিয়া যে তুমুল রাজনৈতিক সংগ্রাম ও সংঘর্ষ চলে তাহার বিবরণ লিখিতে গেলে একখানি বৃহৎ ইতিহাস

লিখিতে হয়। কিন্তু এই সমস্ত রাজনৈতিক চালবাজীর ফলে ক্রমশঃ কামালের শক্তি সঙ্ঘবদ্ধ ও দৃঢ়তর হইয়া আসিতে লাগিল এবং গ্রীকরা ক্রমশঃ আপনাদের অসহায় অবস্থা উপলব্ধি করিতে লাগিল। অবশেষে ১৯২২ সালে আগষ্ট মাসে কামাল আপনার সমস্ত শক্তি সংগ্রহ করিয়া গ্রীক্‌দের শেষবার আক্রমণ করিল এবং এই আক্রমণের ফলে সমস্ত গ্রীক্ সৈন্য একেবারে বিধ্বস্ত হইল। শেষ গ্রীক্‌সেনাটী পর্য্যন্ত আনাটোলিয়া হইতে বিতাড়িত হইল। গ্রীকের পরাজয়ের পর ইয়োরোপের রাজনীতি-মহলে অনেকেই আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে, এইবারে ইংলণ্ড ও তুর্কীতে বুঝি সংগ্রাম বাধে। বস্তুতঃ লয়েড জর্জ্জের শাসন-আমলে বৃটীশ সৈন্যবাহিনী ও রণপোত কনস্‌টাণ্টি-নোপ্‌ল্ অধিকার করিবার জন্য পাঠানও হয়। কিন্তু ইংলণ্ডে ও ইংলণ্ডের বাহিরে এই যুদ্ধের প্রতিবাদ স্বরূপে তুমুল আন্দোলন হয় এবং তাহার ফলে লয়েড জর্জ্জের ক্ষমতারও অবসান হয়। অচিরেই তুর্কী ও মিত্রশক্তিদের মধ্যে সন্ধির ও শান্তি স্থাপনের জন্য রাজনৈতিক বন্দোবস্ত চলিতে লাগিল এবং এই রাজনৈতিক বন্দোবস্তের ফলে তুর্কী আবার সমগ্র এসিয়া মাইনর ও কনস্‌টাণ্টি-নোপ্‌ল্ ফিরিয়া পায় এবং পুরাতন কাল হইতে অটোম্যান রাজ্যে ইয়োরোপের প্রতিনিধিদের যে সমস্ত অধিকার স্বীকৃত হইয়া আসিতেছিল, তাহাও প্রতিরুদ্ধ হইল। এই স্বাধীনতার সংগ্রামে তুর্কী আত্ম-গরিমায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। আপনার গৃহকে সে আবার মহান্ করিয়া দেখিল।

এই জাগরণের প্রেরণা-স্থলে অপূর্ব্ব কর্ম্ম-শক্তির আধার-রূপে রহিয়াছেন—মোস্তাফা কামালপাশা। সমগ্র ইয়োরোপে আমার যত লোকের সহিত দেখা হইয়াছে, এক মুসোলিনী ব্যতীত অন্য কাহারও এত খানি ব্যক্তিত্ব আছে বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার চোখ, মুখ, সর্ব্বাঙ্গ দিয়া একটা সজীব কর্ম্ম-ব্যঞ্জনা স্ফুরিত হইতেছে।

এই সময় কামালের পত্নী লতিফা হানুমের সহিত দেখা করিবার সৌভাগ্যও আমার হইয়াছিল। বর্ত্তমান তুরস্কে পর্দ্দা-প্রথা তিরোহিত হওয়ার দরুণ ম্যাডাম কামালের সহিত ইয়োরোপীয় ধরণেই সাক্ষাৎকার হয়। কামালের জীবনে এই বিবাহ একটী সুন্দর কাহিনী। লতিফা হানুম স্মার্ণার এক জন বিশেষ ধনশালী বণিকের কন্যা। জীবনের অধিকাংশ কাল তিনি ইয়োরোপে জ্ঞানালোচনায় অতিবাহিত করেন।

বিজয়ী সেনার অধিনায়ক রূপে যে দিন কামাল স্মার্ণা শহরে প্রবেশ করেন, সেই গুণমুগ্ধ তুর্ক-রমণী তাহার পিতার সহিত কামালকে অভিনন্দন করিতে আসেন। অভিনন্দনের সময় দুই জনের অন্তরের আলাপ হইয়া যায়। লতিফা হানুমের পিতার অনুরোধে কামাল তাঁহাদের আতিথ্য স্বীকার করেন এবং আমরা জানি এই আতিথ্যের প্রতিদান স্বরূপ তিনি লতিফা হানুমের পাণিগ্রহণ করেন।

কামালপাশার সহিত সাক্ষাতে আমার সহিত যে কথাবার্ত্তা হয়—তাহা প্রকাশ করিবার অধিকার আমার নাই, কারণ আমি

সেখানে খবরের কাগজের প্রতিনিধি হইয়া যাই নাই—আমি সেখানে গিয়াছিলাম তাঁহার অতিথি হইয়া। তবে যখন চলিয়া আসি তখন মনে হইয়াছিল যে, নবীন তুরস্কের শক্তিশালী করিয়া গড়িয়া তুলিতে এত বড় উন্মাদ কর্ম্মশক্তিময় পুরুষ আর নাই। আদর্শের প্রতি এত বড় উন্মাদনা ও তাহা কার্য্যে নিঃসঙ্কোচে পরিণত করিবার এত বড় দৃঢ়তা ইতিহাসে বিরল।"

ষ্টুয়ার্ড মহাশয়ের বর্ণনা হইতে বেশ বোঝা যায় কি অসীম আত্ম-বিশ্বাস ও আত্ম-শক্তির বলে কামাল আজ তুরস্ককে নব-জীবন দিতেছেন।

কামালপাশা একজন পাকা বিদ্রোহী। অবশ্য বিদ্রোহ কথাটার মানে বিংশ-শতাব্দীতে একটু বদলাইয়া গিয়াছে। নূতন কিছু গড়িয়া তুলিতে হইলে অসীম নির্ম্মমতায় পুরাতন অনেক কিছুর অঙ্গে আঘাত করিতে এই সমস্ত বিদ্রোহীদের মনে কোনও দুর্ব্বলতা জাগে না। সেই দিক দিয়া কামাল-পাশা পুরাদস্তুর বিংশ শতাব্দীর শিশু। আচার অনুষ্ঠান ও একটা নির্জ্জীব জীবনের অন্তরালে তুর্কী একাবারে নিবীর্য্য হইয়া পড়িতেছিল—এবং তাহার নিবীর্য্যতার সুবিধা লইয়া য়ুরোপীয় শক্তি-সমূহ তাহাকে তাহার হাতের ক্রীড়নক করিয়া তুলিয়াছিল। অথচ জগতের নিষ্ঠুর প্রতিযোগিতার মধ্যে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে যে শক্তির প্রয়োজন—তুর্কী আচার অনুষ্ঠান ও নানা জড়তা দিয়া তাহার আগমন পথ রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। কামাল দেখিল এই নিদারুণ হেয় অপমানের

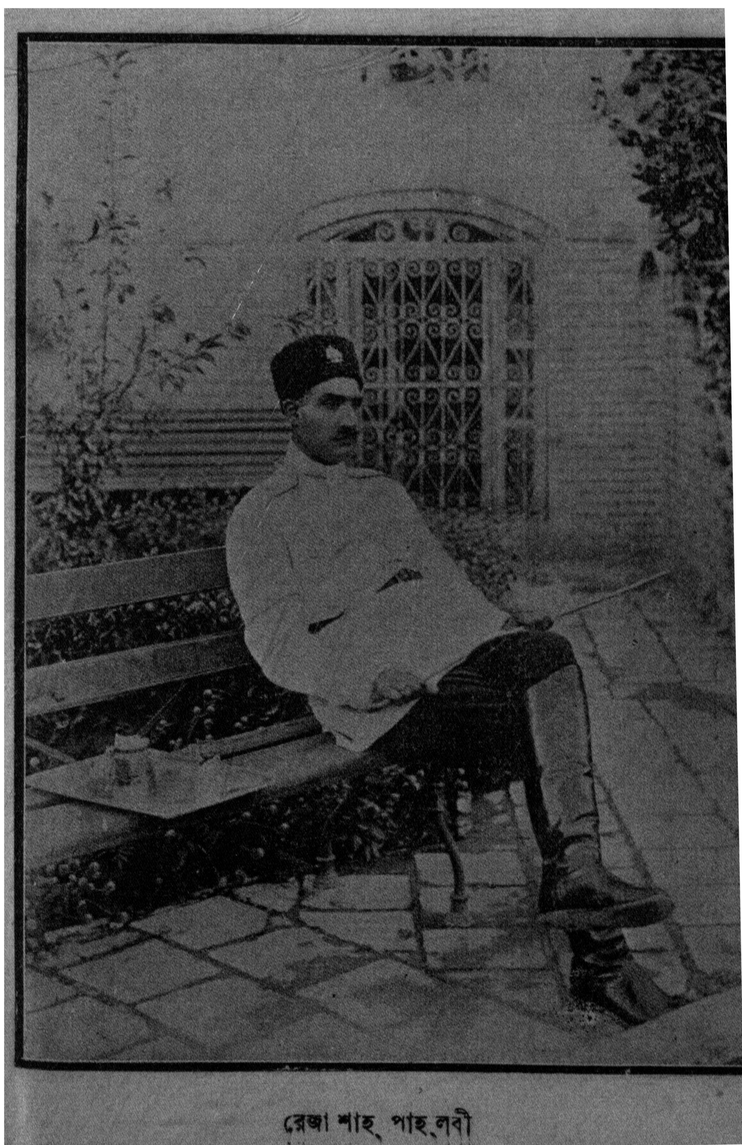
অপ-মৃত্যু হইতে জাতিকে জগতের শক্তিশালীদের মধ্যে টানিয়া তুলিতে হইবে—নতুবা য়ুরোপীয় রাজ-তন্ত্রবাদ যেরূপ প্রসার লাভ করিতেছে—তাহাতে স্ব-ধর্ম্ম বজায় রাখিয়া জাতির জীবন-ধারণ অসম্ভব। প্রথম কথা—জাতিকে বাঁচিতে হইবে—বিংশ শতাব্দীতে কোনও জাতিকে বাঁচিতে হইলে তাহাকে শক্তিশালী হইতে হইবে—যে হিসাবে ইংরাজ শক্তিশালী, যে হিসাবে আমেরিকা শক্তিশালী। এই শক্তি অর্জ্জন করিতে হইলে—আপাততঃ বহু সনাতন আচার-ব্যবহারের জড়তা পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং বিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করিতেই হইবে। কামাল পাশাকেও তাহাই করিতে হইয়াছে। আঙ্গোরার শান্ত মধ্য-যুগের জীবনের মধ্যে ধীরে ধীরে তিনি নব-যুগের রূপ দিতেছেন। কামাল পাশা পশ্চিমের বিজ্ঞানকে গ্রহণ করিয়াছেন। বিখ্যাত বিখ্যাত জার্ম্মাণ এঞ্জিনীয়ার নিযুক্ত করিয়া পুরাতন নগর ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া গড়িতেছেন। পুরাতন মাদ্রাসা যেখানে সামান্য লেখাপড়া আর নিছক তত্ত্ব-আলোচনার যায়গা ছিল—সেখানে পশ্চিমের ধরণে বিশ্ব-বিদ্যালয় খোলা হইতেছে। ষ্টেটের অর্থে বহু তুর্কী যুবক যুবতী য়ুরোপ ও আমেরিকার নানা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে নানা বিদ্যা অর্জ্জন করিয়া আসিতেছেন। কামালের সামাজিক বিদ্রোহের মধ্যে পর্দ্দা প্রথা একাবারে উঠাইয়া দেওয়া—একটা বিশেষ ব্যাপার। আজ তুর্কী রমণী পর্দ্দা-মুক্ত হইয়া তুর্কী যুবকের সঙ্গে একই বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছেন। ধর্ম্ম ব্যাপারেও বহু আচার অনুষ্ঠানের

অবশ্যম্ভাবী আবশ্যকতা কামাল বিদূরিত করিয়া দিয়াছেন। যাহাতে বিজ্ঞানের সাহায্যে আচারের গোঁড়ামীর বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া তুর্কী জাতি জগতের মহা-শক্তিদের সমকক্ষ হইতে পারে—কামাল তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। এবং তিনি যে কৃতকার্য্য হইয়াছেন—বিগত লুসেন কন্‌ফারেন্স তাহার প্রমাণ।

রেজা খাঁ পাহলভী ও নবীন পারস্য

মহা যুদ্ধের অবসানে

ধ্বংসের ভিতর দিয়াই সৃষ্টির নব নব রূপ বিকশিত হইয়া উঠিবে—বিশ্বের এই বিধান। এখানে মঙ্গল আসে অমঙ্গলের ভিতর দিয়া—কল্যাণ আসে অকল্যাণের সহস্র কণ্টক-বর্ত্ম ভেদ করিয়া। গত মহাসমরে ধরণীর শ্যামল বসনাঞ্চল সন্তানের রক্তে রাঙা হইয়া উঠিল—দেশে দেশে জননীরা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল—পত্নীরা অসহায় শিশুর হাত ধরিয়া বিবাহের রাখী খুলিয়া ফেলিল। কিন্তু এই আর্ত্ত হাহাকারের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিল—মানবের কল্যাণকামনা। রুধিরাক্ত ধরণীর বেদনার সায়রে নূতন মানব জাগিয়া উঠিল—দেশে দেশে, দিকে দিকে



রেজা শাহ্ পাহ্লবী

রেজা খাঁ পাহলভী ও নবীন পারস্য

এই অকল্যাণকর মহাযুদ্ধ অজ্ঞাতসারে মানুষের সর্ব্বোত্তম কল্যাণে লাগিয়া গেল। ইয়োরোপীয় শক্তিরা এই যুদ্ধের ফলে আপনাদের অন্তরের সঙ্গে পরিচিত হইল। পশু-শক্তি আপনার দুর্দ্ধমনীয় বেগে আপনিই শ্রান্ত হইয়া পড়িয়া অন্তরের শক্তির দিকে ফিরিয়া চাহিল। আর যে সমস্ত জাতি সাক্ষাৎ ভাবে এই যুদ্ধে যোগদান করে নাই এই যুদ্ধের ঢেউ তাহাদেরও জড়তায় ঘা দিল।

বর্ত্তমান প্রাচ্য জগতের দিকে চাহিলে এ কথা খুব স্পষ্ট ভাবেই বোঝা যায়।

চীনে, ভারতে নব-জাগরণ আসিয়াছে; পারস্যের বুকে আবার আগুন জ্বলিয়া উঠিতেছে। যে কর্ম্মবীরের সহিত পারস্যের এই জাগরনের কাহিনী বিজড়িত, তাহারই অদ্ভুত জীবনের কয়েকটা কথা এখানে লিপিবদ্ধ হইল। রেজা শাহ্ পাহ্লভীর জীবন জগতের কর্ম্মবীরের আদর্শস্থল।

ইয়োরোপীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী দশ বৎসর পারস্যের পক্ষে এক মহা সঙ্কটকাল। দেশের চারি দিকে অরাজকতা ও বিপ্লব। দুর্ভিক্ষে ও রাজস্ব-আদায়ের অব্যবস্থায় রাজকোষও শূন্য। যাহা-কিছু বা কর আদায় হয়, বিলাসী অকর্ম্মণ্য শাহ্গণের বিলাস-ব্যসনেই তাহা খরচ হইয়া যায়। এই সুযোগে ইংরাজ এবং রুষিয়া উভয়েই পারস্যকে গ্রাস করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে লাগিল এবং ইংরাজ উত্তর পারস্যে এবং রুষিয়া দক্ষিণ পারস্যে আপনাদের প্রভাব বিস্তার করিতে বহু পরিমাণে সফলকামও হইল। কিন্তু পারস্যের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন। তাই ঠিক এই সময়ে

ইয়োরোপের দ্বারে দ্বারে প্রলয়ের ডমরুধ্বনি বাজিয়া উঠিল। মহাযুদ্ধের সেই প্রলয়ঙ্কর খেলায় মাতিয়া ইংরাজ এবং রুষিয়াকে তখনকার মত পারস্য অধিকার বাসনাকে বিসর্জ্জন দিতে হইল। পারস্য এই যুদ্ধে যোগ দেয় নাই, তথাপি সম্মিলিত বাহিনী এবং তাহাদের শত্রুসেনা উভয় পক্ষের আক্রমণেই তাহাকে যথেষ্ট ক্ষতি ভোগ করিতে হইয়াছে। যে মহাপুরুষের অক্লান্ত পরিশ্রমে পারস্য আজ এই নব জীবন লাভ করিয়াছে তাহার নাম আলী রেজা খান পাহ্‌লবী বর্ত্তমানে তিনিই শাহানশাহ্‌ রেজা খান পাহ্‌লবী নাম ধারণ করিয়াছেন।

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে পারস্যের মাজেন্দারাণ নামক পার্ব্বত্য প্রদেশের এক ক্ষুদ্র পল্লীতে দরিদ্র কৃষকের গৃহে রেজা খাঁর জন্ম। শৈশবে পিতার কৃষিক্ষেত্রে কাজ করিয়া এবং পাহাড়ে পাহাড়ে মেষ ও ছাগ চরাইয়াই তাহার দিন কাটিত। দরিদ্রতা নিবন্ধন শৈশবে লেখাপড়া শিখিবার সৌভাগ্য ঘটিয়া উঠে নাই। পনেরো বৎসর বয়সে তিনি পারস্যের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ সেনাদল কসাক-বাহিনীতে সামান্য সৈনিকরূপে প্রবেশ লাভ করেন এবং নিজের অসামান্য প্রতিভা ও অসাধারণ কার্য্যকুশলতার প্রভাবে কয়েক বৎসরের মধ্যেই উক্ত বাহিনীরই এক উচ্চ অফিসার পদে উন্নীত হন। এই পদ-প্রাপ্তির পর হইতেই তিনি সমগ্র পারস্য-বাহিনীকে পুনর্গঠিত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু পারস্যের তৎকালীন শাসন-ব্যবস্থা তাহার এই মহান উদ্দেশ্যের অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইল। তিনি আপন চেষ্টায় কয়েক সহস্র কসাক

সৈন্যকে আধুনিক সমর-নীতিতে সুশিক্ষিত করিয়া লইলেন এবং এই সেনাদলই তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের দ্রুত উন্নতির পথে প্রধান সহায় বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

রেজা খাঁর দেহ দীর্ঘ ও সুগঠিত এবং কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ ও কর্কশ। তাঁহার উন্নত ললাট এবং অন্তর্ভেদী দৃষ্টি হইতে মনে হয় তিনি একান্ত কর্ম্মনিষ্ঠ লোক। স্বদেশের সেবা করিয়া বিশ্বের দরবারে তাহাকে তাহার অতীতের গৌরবময় আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যাইবেন—ইহাকেই তিনি জীবনেব একমাত্র সাধনা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

ইঙ্গ-পারসিক চুক্তি

মহা-সমর অবসান হইবার পরই ইংরাজ আবার পারস্যে আপনার স্থান দৃঢ়ীভূত করিয়া লইল এবং সঙ্গে সঙ্গেই পারস্য গবর্ণমেণ্টের নিকট ইঙ্গ-পারসিক-চুক্তি পত্র (Anglo-Persian Agreement) প্রেরিত হইল। এই এগ্রিমেণ্ট অনুসারে ইংরাজ পারস্যকে ২০০০০০০ কুড়ি লক্ষ পাউণ্ড ঋণ স্বরূপ প্রদান করিবে এবং তৎপরিবর্ত্তে পারস্যের সেনা, রেলওয়ে এবং শুল্ক বিভাগ ইংরাজের কর্ত্তৃত্বাধীনে আসিবে। পারস্যের অধিকাংশ লোকই এই এগ্রিমেণ্টের বিরুদ্ধে দাঁড়াইল। কারণ তাহারা বুঝিল, এই চুক্তি-পত্র স্বাক্ষরিত হইলে পারস্য যে অবস্থায় উপনীত হইবে তাহা বৃটিশ অধীনতার নামান্তর মাত্র। সুতরাং দিন দিনই ইহার বিরুদ্ধে আন্দোলন বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

মন্ত্রীর পর মন্ত্রী

এই সুযোগে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে রেজা খাঁন তাহার শিক্ষিত সেনাবাহিনীর সাহায্যে তেহ্‌রান অধিকার করিয়া লইলেন এবং চুক্তি-পত্রের বিরুদ্ধে প্রধান আন্দোলনকারী ডাক্তার জিয়াউদ্দীন নামক এক জন সংবাদ-পত্রসেবীকে উজিরে-আজম বা প্রধান মন্ত্রীপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বয়ং সরদার-ই-সিপাহ্‌ বা প্রধান সেনাপতি-পদ গ্রহণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই ইঙ্গ-পারসিক চুক্তি পরিত্যক্ত হইল এবং পারস্যে ইংরাজের প্রতিপত্তি এবং সম্মান বহু পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়া গেল। কিন্তু জিয়াউদ্দীন মন্ত্রীপদে অনেক দিন স্থায়ী হইতে পারিলেন না। কারণ তিনি স্বদেশের মঙ্গলের জন্য যে সব স্কিম করিলেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে তাঁহার বহু অর্থের প্রয়োজন হইল। কিন্তু রাজকোষ অর্থশূন্য। কাজেই তিনি ইংরাজের নিকট হইতেই সেই অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শাহ্‌ এবং মন্ত্রীসভা কাহারও ইহা মনঃপূত হইল না। রেজা খানও তাঁহার গতিবিধি সন্দেহের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন এবং কৌশলক্রমে তাঁহার দ্বারা পুলিশ বিভাগ স্বরাষ্ট্র-সচিবের হস্ত হইতে সমর-সচিবের হস্তে অর্থাৎ রেজা খানের নিজ হস্তে হস্তান্তরিত করাইলেন। ইহার পরই জিয়াউদ্দীন বুঝিতে পারিলেন, রেজা খান এত শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছেন যে, তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া নিজের সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবেন জিয়া-উদ্দীনের সে ক্ষমতা আর নাই। সুতরাং তিনি পদত্যাগ করিয়া

বাগদাদে ব্রিটিশ আশ্রয়ে পালাইয়া গেলেন। রেজা খান ইহার পরে মুশিরউদ্দৌলাকে প্রধান মন্ত্রী-পদে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই কতিপয় সংবাদ-পত্রে তাঁহার অনুসৃত নীতি সম্বন্ধে মতভেদ হওয়ায় তিনিও পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। তখন খাইয়ামুস্ সুলতানকে তাঁহার স্থানে নিযুক্ত করা হইল। তিনিও সর্ব্বশক্তিধর রেজার সহিত সমপদবিক্ষেপে চলিতে পারিলেন না। কাজেই তাঁকেও পদত্যাগ করিতে হইল। অবশেষে রেজা স্বয়ংই প্রধান মন্ত্রী এবং প্রধান সেনাপতি এই উভয় পদই গ্রহণ করিলেন। এই তিন বৎসর এই পদে থাকিয়া রাজ্যের বহুবিধ উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নিজেও বহুধা শক্তি সংগ্রহ করিয়া লইলেন।

গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা

কিন্তু ইহার মধ্যে পারস্যের হতভাগ্য শাহ্ শুধু সাকী ও শিরাজী লইয়াই মত্ত হইয়া রহিল—একবার ফিরিয়াও দেখিল না যে রাজ্য আছে কি ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। আবার এই সঙ্কট সময়েই ইয়োরোপ ভ্রমণে তাঁহার বাসনা হইল এবং সুন্দরী প্যারিস বিলাস-স্রোতে ডুবিয়া স্বদেশ এবং স্বদেশবাসীকে একেবারে ভুলিয়া গেল। নব-জাগ্রত পারস্য তাহার এই দায়িত্বহীন স্বেচ্ছাচার সহ্য করিতে পারিল না। দেশের চারি দিক হইতে চীৎকার উঠিল—শাহকে সরাও। রেজা খান এই আহ্বানে সাড়া দিলেন এবং শাহকে পদচ্যুত করিয়া পারস্যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিলেন। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গেল, শিক্ষায় পশ্চাৎপদ

পারস্য তখনও গণতন্ত্রের উপযুক্ত হয় নাই। তাই আবার পারস্য মজলিসে প্রশ্ন উঠিল, আর একজন উপযুক্ত শাহ—নির্ব্বাচিত করা যায় কি না। তখন জাতীয় বীর রেজা খাই ২২৭ ভোটের আধিক্যে পারস্যের শাহানশাহ বলিয়া ঘোষিত হইলেন। যে ব্যক্তি দরিদ্রতা নিবন্ধন শৈশবে লেখা-পড়া পর্য্যন্ত শিখিতে পারেন নাই, এইরূপে সেই ব্যক্তিই একান্ত অধ্যবসায় ও অক্লান্ত কর্ম্মশক্তির প্রভাবে আজ বিশ্বের এক শ্রেষ্ঠ পদে অধিরূঢ় হইয়াছেন।

রুষিয়া ও পারস্য

মহাযুদ্ধের সময় যখন রুষিয়াতে বিপ্লব আরম্ভ হইল, তখন কিছু দিনের জন্য রুষিয়া পারস্য হইতে সরিয়া গেল। কিন্তু এই বিপ্লবের ভিতর দিয়া যে নব রুষিয়া জন্মগ্রহণ করিল, সাম্রাজ্যবাদী ডেনিকিন, রেঙ্গেল এবং অন্যান্য রুষিয়ান নেতাদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া আবার সে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে পারস্য-ভূমিতে দেখা দিল। পূর্ব্বেকার হইতে এবার তাহার মনোভাব সম্পূর্ণ বিভিন্ন। জারের সময় রুষিয়া পারস্যের সহিত সকল প্রকার ব্যবহারেই অভ্যস্ত ছিল—কখনও একান্ত হিতৈষী বন্ধু, কখনও বা সর্ব্বনাশ-প্রয়াসী ভীষণ শত্রু। কিন্তু ১৯২১ সনে যে রুষিয়া আসিল, সে সত্যকারের বন্ধুত্ব এবং সত্যকারের হিতৈষণা লইয়াই আসিল। সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের তেহরাণস্থ প্রথম প্রতিনিধি এম্, থিয়োডোর এ, রথষ্টিন (M. Theodore A. Rothstin) তাঁহার আতাবেগ

পার্কস্থিত দূতাবাস সকল পারসিকের জন্যই মুক্তদ্বার করিয়া রাখিলেন। ঐ বৎসরই মস্কোতে রুষিয়া এবং পারস্যের মধ্যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। রুষিয়ার নিকট পারস্যের যে ৬০,০০০০০ লক্ষ পাউণ্ড ঋণ ছিল, এই সন্ধি অনুসারে তাহা রদ হইয়া গেল এবং যে সকল জমি, বৃহৎ ইমারত, রাস্তা, জেটি এবং জুলফা হইতে তাব্রীজ পর্য্যন্ত রেল-লাইনের অংশ ও উরুমিয়া হ্রদে যে সকল ষ্টীমার তখন পর্য্যন্ত রুষিয়ার অধিকারে ছিল, সকলই পারস্যকে প্রত্যর্পণ করা হইল। ব্যাঙ্ক-ডিএস্কম্‌টি-ডি পার্‌সি (Banque d' Escompte de Perse) নামক রুষিয়ান ব্যাঙ্কটীও পারস্য গভর্ণমেণ্টের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের এই সকল বন্ধু-ব্যবহারের জন্য রেজা খান রুষিয়ার প্রতি খুবই কৃতজ্ঞ হইলেন বটে, কিন্তু তিনি বলশেভিক-মতবাদ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। পক্ষান্তরে রুষিয়ার গোপন সাহায্যে পারস্য দেশীয় যে সকল তুর্কমেন বিদ্রোহ ঘোষণা করিল, তিনি তাহাদিগকে কঠোর হস্তে দমন করিলেন। এমন কি, বলশেভিকদিগকে সাহায্য করিতেন এই সন্দেহে স্বরাষ্ট্র-সচিব আমীর ইখ্‌তোদারকেও গ্রেফ্‌তার করা হইল।

পারসিক সৈন্য-বিভাগ

পারসিক সৈন্যদল বহু জাতি দ্বারা বহু বার বহু রূপে গঠিত হইয়াছে—সে প্রাচীন ইতিহাসের কথা। কিন্তু আধুনিক কালেও পারস্য-বাহিনীর অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। রেজা খানের

অভ্যুত্থানকাল পর্য্যন্ত যে সকল সেনা-বাহিনী ছিল তন্মধ্যে "দক্ষিণ পারস্য রাইফেল বাহিনী" "কসাক বাহিনী" এবং "পুলিস বাহিনী"ই প্রধান। রাইফেল বাহিনীতে সেনা সংখ্যা ছিল ৬০০০ সহস্র। ইহারা ইংরাজ সামরিক পরামর্শদাতার কর্ত্তৃত্বাধীনে শিক্ষিত হইত। কসাক বাহিনীর সংখ্যা ছিল ১০০০০ সহস্র। রুষিয়ান সামরিক বিশেষজ্ঞগণ ইহাদিগকে পরিচালিত করিত। পুলিস বাহিনীর সংখ্যা ৮৪০০ জন—সুইডেন দেশীয় পরামর্শদাতাদের সাহায্যে ইহারা গঠিত হইয়াছিল। রেজা খান এখন এই সেনাদল সমূহ পুনর্গঠীত করিয়াছেন এবং বিদেশী পরামর্শদাতাদিগকে সরাইয়া দিয়া তৎস্থানে পারস্য দেশীয় লোক নিযুক্ত করিয়াছেন। এই নব-গঠিত বাহিনী ট্যাঙ্ক, এরোপ্লেন ও দক্ষ গোলন্দাজ সৈন্য দ্বারা সুসজ্জিত করা হইয়াছে এবং সমগ্র বাহিনীকে ছয় ভাগে বিভক্ত করিয়া দেশের বিভিন্ন স্থানে শান্তি রক্ষার্থ স্থাপন করা হইয়াছে, ইহার প্রত্যেক বিভাগে ৩৫০০০ হাজার সৈন্য। রেজা খান বেতন-ভুক্ এবং অবৈতনিক সামরিক কর্ম্মচারিগণের শিক্ষার জন্য বড় বড় শহরে স্কুল স্থাপনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত প্রতি বৎসর ৬০ জন করিয়া ছাত্র ফ্রান্সে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য প্রেরিত হয়। বর্ত্তমানে দেশে সামরিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। এই আইনের বলে পারস্যের ২১ বৎসর হইতে ৪০ বৎসর বয়স্ক প্রত্যেক পুরুষকে সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে এবং প্রত্যেককেই অন্ততঃ ২ বৎসর সরকারের সৈন্য-বিভাগে কাজ করিতে হইবে।

রেজা খাঁ পাহলভী ও নবীন পারস্য

রেজা খান তাঁহার নূতন বাহিনীর সাহায্যে সমগ্র পারস্য দেশকে আবার একীভূত করিয়াছেন। পূর্ব্বে সমগ্র দেশ ব্যাপিয়া অরাজকতা বিরাজ করিতেছিল। প্রাদেশিক সর্দ্দারগণ কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টকে অগ্রাহ্য করিয়া রাজস্ব প্রদান করিতে অস্বীকার করিত। কুলচিক খাঁ গিলানের জুগালীদের ভিতর এক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিলেন। মেসোপটেমিয়ার সীমান্তবর্ত্তী 'লার' জাতি প্রতিনিয়তই বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করিতেছিল। ইব্রাহিম আগা-সিম্‌কোর অধিনায়কতায় কুর্দ্দেরা স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতেছিল। আরবিস্তানের সর্দ্দার ও মোহাম্মারার শেখও সেই-পন্থাই অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু রেজা খান তাহাদের সকলকে পরাভূত করিয়া কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টকে সম্মান করিতে তাহাদিগকে বাধ্য করিলেন। এই গৌরবময় মহান্ কার্য্যের জন্য পুণ্যতীর্থ নজফের ধনাগার হইতে রেজা খানকে মণি-মুক্তা-খচিত এক তরবারি উপহার দেওয়া হইল।

পারস্যের তৈল-সম্পদ

খনিজ সম্পদে পারস্য অত্যন্ত ধনবান। কিন্তু তাহার অতি সামান্য অংশই কাজে লাগানো হইয়াছে। পারস্যের খনিসমূহে এত তৈল জমা আছে যে, পূর্ণভাবে উত্তোলন করিতে পারিলে ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সের সমপরিমাণ তৈল এখানেই পাওয়া যাইতে পারে। বর্ত্তমানে জগতের তৈল-সম্পদের শতকরা পঁয়ষট্টি ভাগই ইউনাইটেডষ্টেট্‌স প্রদান করে। যাহা হউক এই অপূর্ণ ব্যবস্থাতেও

পারস্য পৃথিবীর তৈল-উৎপাদনকারী দেশসমূহের মধ্যে পঞ্চম স্থান অধিকার করিয়াছে। পারস্যের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে এংলো পারশিয়ান অয়েল কোম্পানী কয়েক বৎসর তৈল উত্তোলন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে। লাভের শতকরা ষোল অংশ পারস্য গভর্ণমেণ্টকে প্রদান করিতে হয়। উত্তর অঞ্চলের তৈলখনি সমূহ এখনও কাজে লাগানো হয় নাই। ১৯১৬ সনে খোসথেরিয়া নামক এক জন রুষীয় প্রজা উত্তর পারস্যের খনিসমূহ হইতে তৈল উত্তোলনের অধিকার লাভ করেন, কিন্তু তিনি এই কার্য্যে অসমর্থ হওয়ায় North Persian Oils Ltd নামক Anglo-Persian Oil Company-র অন্য আর এক শাখার নিকট তাহার স্বত্ব বিক্রয় করিয়া ফেলেন। সুতরাং যখন যুদ্ধ শেষ হইয়া গেল, তখন Anglo-Persian Oil কোম্পানী উত্তরাঞ্চলের খনিসমূহে তৈল উত্তোলনের অধিকার দাবী করিয়া বসিল। কিন্তু পারস্য গভর্ণমেণ্ট খোসথেরিয়ার স্বত্ব বিক্রয় করিবার অধিকার নাই, এই অজুহাতে অয়েল কোম্পানীর দাবী অগ্রাহ্য করিল। ইহার পর ইহারই জন্য আমেরিকার Standard Oil Company আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন ইংরাজ এবং আমেরিকার কোম্পানীর মধ্যে মনোমালিন্য দেখা দিল। কিন্তু শীঘ্রই বিবাদ মিটমাট হইয়া যায়। স্থির হইল Standard Oil Company-কে মেসোপটেমিয়ার খনিসমূহে কিছু অধিকার প্রদান করা হইবে এবং তৎবিনিময়ে Anglo-Persian Oil Company উত্তর পারস্যের খনিসমূহে যে লাভ হইবে তাহার কিয়দংশ পাইবে; ইংরাজ

এবং আমেরিকান Oil Companyর এই চুক্তিপত্র দেখিয়া রুষিয়া একটু ভীত হইয়া পড়িল এবং এই ব্যবস্থাতে আপত্তি উত্থাপন করিল। ফলে পারস্য গভর্ণমেণ্ট Standard Oil Company-কে অধিকার দানে অস্বীকার করিল। অবশেষে গত পূর্ব্ব বৎসর পারস্য গভর্ণমেণ্টকে কিঞ্চিদধিক দুই লক্ষ পাউণ্ড অগ্রিম ঋণ প্রদান করিবে এই স্বর্ত্তে পারস্যের উপরি-উক্ত অংশেই তৈল উত্তোলনের অধিকার পাইবার জন্য Sinclair oil Company আবেদন করিয়াছিল। কিন্তু এই সময় তেহরাণস্থ আমেরিকার ভাইস-কন্‌সাল রবার্ট (Robert Imbori) নিহত হওয়ায় কোম্পানী ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌স্ হইতে ঋণ সংগ্রহ করিতে পারিল না। সুতরাং অনুমতিও দেওয়া হইল না।

রেল-লাইন

পারস্য বহির্জগতের সহিত অনেকটা বিচ্ছিন্ন। কারণ তাহার অভ্যন্তরে অথবা সীমান্তবর্ত্তী দেশসমূহে রেলওয়ে বিস্তার খুব কমই হইয়াছে। উষ্ট্র এবং অশ্বের সাহায্যেই ইহার আমদানী রপ্তানী কার্য্য সমাধা হয়। কিন্তু অল্প:কয়েক বৎসর যাবৎ অবস্থার অনেকটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পূর্ব্বে লোকে একমাত্র বস্‌রা হইয়া পারস্যে যাইতে পারিত, কিন্তু এখন বাগ্দাদ হইতে তেহরাণ পর্য্যন্ত সপ্তাহে এক বার করিয়া মোটর যাতায়াত করে। বৃটিশ এবং তুর্কি রেল-লাইনসমূহ শীঘ্রই সীমান্তবর্ত্তী রাজ্যসমূহের সহিত পারস্যের যোগাযোগ সাধন করিয়া দিবে। দেশের

অভ্যন্তরে মোটর লরী ও মোটর ট্রাকসমূহ অশ্ব ও উষ্ট্রের স্থান অধিকার করিতেছে। এতদ্ব্যতীত পারস্য সরকার এখন রাজ্যের সর্ব্বত্র রেলওয়ে লাইন বসাইবার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করিতেছেন। পারস্য মজলিসের মন্ত্রণা-সভা পারস্য উপসাগর হইতে কাস্পিয়ান হ্রদ পর্য্যন্ত রেল-লাইন বিস্তারের জন্য ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন এবং উহার প্রথম কিস্তীতে পাঁচ লক্ষ তুমান দেওয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।

রাজস্ব-বিভাগের সংস্কার

১৯২৩ সনের শরৎকালে ওয়াশিংটনের স্বরাষ্ট্র-বিভাগের অর্থনীতি বিষয়ক পরামর্শদাতা Dr. A. C. Millspaugh বার্ষিক ১৫০০০ হাজার ষ্টারলিং বেতনে পাঁচ বৎসরের জন্য পারস্যের রাজস্ব-বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল পদে নিযুক্ত হন। তিনি এক দল রাজস্ব-বিশারদ সহকারীর সাহায্যে ইতিমধ্যেই এই বিভাগের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছেন। কর-প্রথার পরিবর্ত্তন করিয়া দেশের সর্ব্বত্র রাজস্ব আদায় করিতে সমর্থ হইয়াছেন। রেজা খানের নব-গঠিত সেনাদল এই রাজস্ব আদায় বিষয়ে তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। তিনি সিভিল সার্ভিস আইন প্রবর্ত্তন ও তৎসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পদের সৃজন করিয়া পদানুযায়ী বেতন নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। তামাকের শুল্ক বৃদ্ধি করা হইয়াছে। ডাঃ মিল্‌স্‌পার কার্য্যভার গ্রহণের প্রথম বৎসরের শেষেই রাজ্যের আয়-ব্যয় সমান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। চলতি

ব্যয়ের জন্য পারস্য গভর্ণমেণ্টের এখন আর বিদেশী ঋণের প্রয়োজন হয় না। ঐ বৎসরই (১৯২৩) পূর্ব্ব বৎসর (১৯২২) অপেক্ষা ১০০০০০০০ এক কোটী পাউণ্ড মূল্যের জিনিস বেশী রপ্তানী হয়। চিনি এবং চায়ের উপর এক নূতন কর বসানো হইয়াছে, ঐ আয়ে রেলওয়ে লাইন তৈয়ারী করা হইবে। উত্তর পারস্যে এক জর্ম্মান উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছে। সেখানে আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক কৃষি-যন্ত্রাদি জর্ম্মানী হইতে আমদানী করা হইতেছে। দুনিয়ার বাণিজ্যের বাজারে পারস্যের মুদ্রাঙ্কনের মূল্য ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে, দেশে কাগজের মুদ্রা মোটেই ব্যবহৃত হয় না এবং তাহার জাতীয় ঋণও বেশী নহে। কাজেই পারস্যের ভয়ের কোন কারণ নাই, তাহার ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল।

স্বদেশিকতা, ধর্ম্ম ও শিক্ষা

রেজা খান স্বদেশী শিল্পের খুব উৎসাহ-দাতা। পারস্যের মিলসমূহে যে বস্ত্র তৈয়ারী হয়, কেবল মাত্র সেই বস্ত্রেই তিনি তাঁহার পোষাক প্রস্তুত করেন এবং গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণকে তাহাই ব্যবহার করিতে আদেশ দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত কম্বল, মৃৎপাত্র, পিত্তল ও রৌপ্যের জিনিস নির্ম্মাণেও খুব উৎসাহ দিয়া থাকেন। যদিও দুর্ভাগ্যবশতঃ ১৯২৬ সনে মেজর ইম্‌ব্রির হত্যা-কাণ্ড ঘটিয়া যায়, তথাপি ইহা জোরের সহিতই বলা যাইতে পারে যে, ধর্ম্ম সম্বন্ধে পারস্যে যথেষ্ট উদারতা ও স্বাধীনতা রহিয়াছে। খ্রীষ্টান, ইহুদী, পার্সী এবং বাহাইগণ, প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধর্ম্ম-

মন্দিরে স্বাধীনভাবে উপাসনা-কার্য্য সমাধা করিতে পারে। শাহের সিংহাসন-চ্যুতির পরেই রেজা খান সমস্ত মদের দোকান এবং জুয়া-খেলার আড্ডা বন্ধ করিয়া দেন। এখন সংবাদপত্রও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রায় সকল পত্রিকাই রেজা খানের গণতন্ত্র স্থাপনের পক্ষে ছিল। তবে সকল সংবাদপত্রই খুব স্বাধীন মতাবলম্বী নয়। কখনও ইয়োরোপীয়দিগের বিরুদ্ধে অত্যধিক লেখালেখির দরুণ এবং কখনও বা রেজা খানকে অতিরিক্ত প্রশংসা করিবার নিমিত্ত তিনি পত্রিকার সম্পাদকদিগকে শাস্তি প্রদান করিতেও বিরত হন না। খৃষ্টান মিশনারী এবং বাহাই-দিগকে বালকবালিকাদের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপনে খুব উৎসাহ দেওয়া হয়। প্রতি বৎসরই দলে দলে ছাত্র উচ্চতর পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভের জন্য বিদেশে প্রেরিত হয় এবং এই সকল ছাত্র শিক্ষিত হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিলে তাহাদিগকে রাজ্যের উচ্চ উচ্চ পদে নিযুক্ত করা হয়।

রেজা খান্ ও মোস্লেম জগত

রেজা খান ইস্লামের একত্বে দৃঢ় বিশ্বাসবান্। পারস্যের অধিকাংশ লোকই শিয়া মতাবলম্বী—এই জন্য তিনি বিশেষ কিছুই মনে করেন না। তিনি বলেন, "আমরা আগে মুসলমান, তারপর শিয়া অথবা সুন্নী।" একবার তিনি ইস্লামের বিচ্ছিন্ন শক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন, "হায়, যে ইস্লাম ইতিপূর্ব্বে মহাসাগর ছিল আজ সে সামান্য ডোবা মাত্র।"

ইস্‌লামের স্বপ্ত একতা ফিরাইয়া আনিবার জন্য তিনি তুরস্ক এবং আফগানিস্থানের সহিত রাজনৈতিক এবং বাণিজ্য-বিষয়ক সন্ধি-স্থাপন করিয়াছেন। গ্রীসের উপর তুর্কীর জয়ে তিনি এতদূর আনন্দিত হইয়াছিলেন যে, তিনি গাজী মোস্তফা কামালপাশার নিকট উপহার স্বরূপ মণি-মুক্তা-খচিত একটী তরবারি প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং তদবধি তিনি এই তুর্কী বীরের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিতে চেষ্টা করিতেছেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যখন কামাল পাশা তুর্কী আইন সমূহ আধুনিকভাবে বিধিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিলেন, তখন রেজা খানও পারস্য দেশীয় আইন সংস্কারের জন্য ফরাসী আইন-বেত্তা নিযুক্ত করিলেন। বর্ত্তমান জগত পারস্য সম্বন্ধে খুব কমই জানে। সে তাহার অতীতের গৌরব হারাইয়া অরাজকতা ও অধঃপতনের গভীরতম গর্ভে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছিল। ভবিষ্যতের সকল আশা, সকল আলো যেন চিরতরে নিভিয়া গিয়াছিল। আজ রেজা খানের যাদুকরী হস্তের সোনার কাঠির স্পর্শে সে মৃত দেহে আবার যেন প্রাণের সঞ্চার হইয়াছে—হয় ত অদূর ভবিষ্যতে সে দিন আসিতেছে, যখন বিস্ময়-স্তব্ধ জগত তাঁহার বিজয়দীপ্ত গৌরবের দিকে মুগ্ধ হইয়া চাহিয়া থাকিবে।

জগ্‌লুল পাশা ও মিশর

অতীত গৌরব-বাহিনী নীল নদের কূলে মমীর মিসর পড়িয়া আছে। কোথাও নীল, কোথাও একেবারে বৈরাগীর মত রুক্ষ, উদাস। মিসর পড়িয়া আছে—যুগ-যুগান্ত ধরিয়া। উদাস মরু-জীবনের মধ্যে এমনি পড়িয়া থাকিত—শুধু অতীতের স্মৃতি-স্তম্ভকে গৌরবের সাক্ষী রাখিয়া। কিন্তু মিসরের অতীত গৌরবের প্রতিনিধি-রূপে উনবিংশ শতাব্দীতে এক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন, যিনি আবার মমীর মিসরকে জাগাইয়া তুলিলেন। নীলের নীল জলে আবার মিসরের যৌবন জাগিয়া উঠিল। জগতের জাগর-লোকে মিসরের শূন্য আসন আবার পূর্ণ হইতে চলিল। এই জাগরণে মনে হয় যেন নীলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, যৌবনের



জগলুল পাশা

প্রতীক্, ক্লিওপেট্রা তাঁহার শেষ-প্রিয় রোমান আণ্টনীর মৃত-দেহের মধ্য হইতে আবার যেন জাগিয়া উঠিয়াছে এই বিংশ শতাব্দীর আর এক অভিনব আলোক, আর এক বীর-যোদ্ধার সিংহাসনের সম্মুখে।

সে বীর-যোদ্ধার নাম সা'দ্ জগলুল পাশা—বর্ত্তমান মিসরের জীবন-দাতা ও আদর্শ। দীর্ঘ অক্লান্ত বিপদ-সঙ্কুল পথের মধ্য দিয়া জগ্‌লুল জাতিকে আজ জাগ্রত করিয়া অমৃত-লোক-যাত্রী। জগলুল মৃত একথা যে কত বড় মিথ্যা—মিসরের জাগ্রত যৌবন জগতে তাহার সাক্ষ্য দিবে।

জগতের সমস্ত মহাপুরুষদের ব্যক্তিগত জীবন এমন একটা সীমায় আসিয়া পৌছায়, যখন তাঁহাদের জীবন শুধু তাঁহাদের প্রচারিত-বাণীর প্রতীকরূপেই প্রতিভাত হইতে থাকে। তাঁহাদের দেহের বিনাশের সঙ্গে তাঁহারা বিনষ্ট হন না। অনন্ত কাল ধরিয়া জাতির আশা, আকাঙ্ক্ষা ও পতন-অভ্যুদয়ের মধ্যে তিনি জাগিয়া থাকেন। যত দিন না মিসর পরিপূর্ণরূপে স্বাধীন হয়, তত দিন পর্য্যন্ত জগলুল প্রত্যেক মিসরবাসী যুবকের অন্তরের স্পন্দনের সঙ্গে জাগিয়া থাকিবেন।

আজিকার জগতের চারিদিকে চাহিলেই একটা জাগরণের রূপক সদা-সর্ব্বদা মনে জাগে। বহু দিনের পরিশ্রমের পর সমস্ত প্রাচী যেন নিস্তেজ নির্ব্বীর্য্য হইয়া পড়িয়াছিল। পশ্চিম ভাবিয়াছিল যে, প্রাচী তাহার অসংখ্য শিলা-স্তম্ভে, তাহার স্মৃতি-সৌধে, তাহার অতীতের পাষাণ-মহলে আপনারই কবর রচনা করিয়াছে।

সেই ধারণার বশীভূত হইয়া পশ্চিম প্রাচী'র নিস্তরঙ্গ নদীর কূলে কূলে আপনার বাণিজ্য-পোত, আপনার রাজ্য-শাসন আনিয়া ফেলিল। প্রাচী'র ঘুমন্ত-পুরীতে সে রাজ-পুত্রের বেশে সোণার কাঠি ছোঁয়াইয়া রাজলক্ষ্মীকে জিয়াইতে আসে নাই—সে আসিয়াছিল দৈত্যের বেশে। কিন্তু কখন ভুলক্রমে সেই সোনার কাঠির পরশ দিল। প্রাচী'র ঘুম-মহলে রাজ-পুত্র সোনার কাঠি আনে নাই—আনিয়াছিল এক দৈত্য। রাজ-পুত্রই আমুক্ অথবা দৈত্যই আসুগ—প্রাচী'র ঘুম-মহলে সোনার কাঠি ছোঁয়া লাগিয়াছে। প্রশান্ত-মহাসাগরের কূল হইতে তাই মিসরের মরুস্থান পর্য্যন্ত জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

১৮৫০ খৃ অঃ জগলুল এক সম্ভ্রান্ত কৃষাণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা বিখ্যাত শেখ-বংশেরই অন্তর্ভুক্ত। গ্রামের বিদ্যালয়েই তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা সমাধান হয়। গ্রামের অধ্যয়ন শেষ করিয়া জগলুল কায়রোর জগৎ-বিখ্যাত আল-আজ্‌হার বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। এই সময় জগলুলের জীবনের এক মহা-সন্ধিক্ষণ। জাতির জাগরণের যে স্বপ্ন তিনি প্রৌঢ়ে সফল করিয়া তুলিতে জীবন পণ করিয়াছিলেন—সেই স্বপ্ন প্রথম জাগে এই আল-আজ্‌হারের সহস্র বৎসরের স্মৃতি-পবিত্র ধামে।

এইস্থানে মুসলমান জগতের আর এক মহা-পুরুষের নাম উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজনীয়। তিনি তাঁহার বেদনা-বিদগ্ধ যাযাবর জীবন দিয়া সমগ্র মোস্‌লেম জগৎকে সজীব করিয়া

তুলিবার কঠোর পণে জীবনকে মরণের অধিক ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছিলেন এবং জগলুলের অন্তরের সুপ্ত-সিংহকে তিনিই জাগাইয়া দেন। তাঁহার নাম জামাল-উদ্-দীন আল আফগানী। জামাল-উদ্দীনের নাম আজ জগতের শ্রেষ্ঠ কর্ম্মী ও জ্ঞানীদের মধ্যে সমান ভাবে সর্ব্বত্র উচ্চারিত হয়। তাঁহার জীবনের একটী আদর্শ ছিল—সে শুধু ঘুমন্ত মোস্‌লেম-জগৎকে জাগাইয়া তোলা। তাই তিনি আফগানিস্থানের মন্ত্রীর পদ ত্যাগ করিয়া পরিব্রাজকের বেশে মিসর হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত সমস্ত নগরে তাঁহার মহা-আদর্শ প্রচার করিয়া বেড়ান।

তাঁহার শৈশব ও জন্মভূমি আজও রহস্যে সমাচ্ছন্ন। আফগানিস্থানের কোনও নিভৃত গ্রামে হয়ত তাঁহার জন্ম। তাঁহার জন্মভূমি ঠিকানা কেহই জানে না এবং তাঁহার শৈশবের জীবনও সেই নাম-হীন জন্মভূমির বিস্মৃতির প্রাচীরে আবদ্ধ। তখন আফগানিস্থান ও পাঞ্জাবের প্রান্ত-ভূমে শিক্ষা-দীক্ষার সে রকম কোনও সুব্যবস্থা ছিল না, তাই শৈশবে যে তিনি বিশেষ কোনও শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন—তাহাও মনে হয় না। কেহ বলেন, তাঁহার কৈশোর অতিবাহিত হইয়াছে পারস্যে, কেহ বা বলেন আফগানিস্থানে। কিন্তু জামাল-উদ্দীন স্বীয় অসামান্য প্রতিভার বলে নানা ভাষা ও বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠেন। জাগরণের অগ্রদূত রূপে দেশ-দেশান্তরে পরিভ্রমণ করিতে করিতে তিনি মিসরে কায়রোর আল-আজহারে অতিথিরূপে উপস্থিত হন। কিছুকাল সেই প্রাচীর শিক্ষা-পীঠে

অবস্থান করার ফলে তাঁহার অপূর্ব্ব জ্ঞান-গরিমার কথা সমস্ত মিসরে ছড়াইয়া পড়িল। এইখানে জামালউদ্দীন তাঁহার জীবনের অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাজ করিয়া যান। তিনি একটী তরুণ মিসরীয় যুবকের বুকে জাতির আত্মগ্লানির সৌধ ভাঙ্গিয়া নূতন মিসর, নূতন যুবকের দল গড়িয়া তুলিবার বাসনা জাগ্রত করিয়া যান। জগলুল যৌবনে উপযুক্ত গুরুর নিকট হইতেই জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। ইয়োরোপ পরিভ্রমণকালে জামাল-উদ্দীন যখন প্যারিসে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক রেনঁা জামাল-উদ্দীনের সঙ্গে পরিচিত হইয়া বলিয়াছিলেন,—"আমি ইহার মধ্যে এব্‌নে রোশাদের আত্মা দেখিতে পাইলাম।" তিনি কলিকাতা এবং হায়দ্রাবাদেও আসিয়াছিলেন, কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় যে ভারতবর্ষ তাঁহাকে চিনিতে বা বুঝিতে পারে নাই।

জামালউদ্দীন বিপ্লব-বাণী জগলুলের অন্তরকে নিশিদিন আন্দোলিত করিতে লাগিল। প্রথমে **"Offiicial Journal"** নামক কাগজের সম্পাদক-রূপে জগলুল সাধারণের সঙ্গে পরিচিত হন। কিন্তু তাঁহার জীবনের ধারা অন্য দিকে চলিয়াছিল। তাঁহার সম-সাময়িক ইংলণ্ডের অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক লয়েড জর্জ্জের ন্যায় তিনিও প্রথম যশস্বী হন—আইন-ব্যবসায়ী-রূপে। জগলুলকে **Curson** (ইংলণ্ডে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যারিষ্টার) **of the Egyptian Courts,**—ইজিপ্টের আদালতের 'কারসন' বলা হয়। (বর্ত্তমান জগতের অধিকাংশ নেতাই প্রথমে আইন-

ব্যবসায়ী ছিলেন দেখা যায়;—যথা, লেনিন, ডি, ভ্যালেরা, গান্ধী, চিত্তরঞ্জন, জগলুল, প্রভৃতি।) তাঁহার আইন-ব্যবসায়-জীবনের এক ঘটনা বর্ণনা করিলেই তাঁহার আইন-ব্যবসায়ীরূপে ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যাইবে। ঘটনাটী এই,—একবার বারো জন লোক হত্যা-অপরাধে দণ্ডিত হয়। তিনি তাঁহাদের এক জনের উকিলরূপে ক্রমান্বয়ে সাত ঘণ্টা ধরিয়া অবিশ্রান্ত বলিয়া চলেন। তাহাতে বিচারক মৃদুস্বরে জগলুলকে জানাইলেন যে আদালতের সময়ের মূল্য আছে। যুবক উকিল বিচারকের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া উত্তর দিলেন, "আমার আসামীর জীবন তদপেক্ষা অধিক মূল্যবান্।" এই কথা বলিয়াই খাতা-পত্র সমস্ত ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া জগলুল আদালত-গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যান। পরের দিন বিচার আরম্ভ হইলে জগলুল পূর্ব্ব দিবস সাত ঘণ্টা ধরিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, পুনরায় অবিকল তাহার পুনরাবৃত্তি করিলেন। বলা বাহুল্য, সে যাত্রা তাঁহার আসামীটী মুক্তি পাইয়াছিল।

যৌবনে জগলুল ফরাসী ভাষা শিক্ষা করেন এবং ফরাসী আইন অধ্যয়ন করেন। তিনি তদানীন্তন মন্ত্রী মোস্তাফা ফেহমীর কন্যার পাণি-গ্রহণ করেন। জগলুলের সহধর্ম্মিণী প্রাচ্য-জগতে নারী-জাগরণের এক জন নেতা এবং স্বামীর পার্শ্বে থাকিয়া তিনি চিরদিন স্বামীর কার্য্যে সম্পূর্ণ আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন।

জগলুলের আইন-ব্যবসায় গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই মিসরের যুবক-মহলে তাঁহার একটা ব্যক্তিগত প্রতিপত্তির স্থান ছিল।

১৮৮২ সালে আরাবীর সৈন্যদলকে পরাজিত করিয়া ইংরাজরা মিসর অধিকার করে। ইংরাজদের মিসর বিজয়ের কিছুকাল পরেই কয়েক মাসের জন্য জগলুলকে রাজনৈতিক কারণে অবরুদ্ধ করিয়া রাখা হয়। এই তাঁহার জীবনে প্রথম দুঃখের দীক্ষা। অবরোধ হইতে মুক্তি পাইয়া তিনি আদালতে প্রবেশ করেন এবং আপন প্রতিভার বলে বিচারকের আসনে অধিষ্ঠিত হন। মিসরের প্রথম বৃটিশ হাই কমিশনার জগলুলের প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া ১৯০৬ সালে তাঁহাকে শিক্ষা-বিভাগের মন্ত্রীর পদে নিয়োগ করেন। ১৯১৪ সালে ইংরাজের অধিষ্ঠিত ব্যবস্থা-সভায় প্রথম উদ্বোধন হয়, তখন জগলুল ছিলেন তাহার সহকারী সভাপতি। শিক্ষা-সচিব হিসাবে জগলুল দেশের যে মহান্ উপকার সংসাধিত করেন, তাহা স্বয়ং ক্রোমার সরল চিত্তে স্বীকার করিয়া বলিয়া গিয়াছেন,—মিসরের অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করিবার জন্য যদি কাহাকেও ধন্যবাদ দিতে হয়—সে জগলুল পাশা।

তখন পৃথিবীর বাহিরে দেশে দেশে, মিসরে, চীনে, গ্রীসে, ইতালীতে, ভারতে, আয়ারল্যাণ্ডে, একটা আন্দোলনের আভাস জাগিতেছিল, কিন্তু তাহা কোনও পরিপূর্ণ রূপ পরিগ্রহণ করিতেছিল না। পৃথিবীর চারিদিকে একটা অসন্তোষের চিহ্ন; কিন্তু প্রত্যেকেই কোনও না কোন রকমে সেই অসন্তোষের চিহ্নগুলিকে সযত্নে ঢাকিয়া রাখিয়া চলিয়াছিল। প্রত্যেক দেশের আকাশে অমঙ্গলের মেঘ, প্রত্যেক জাতির মুখে এক দিকে দম্ভ আর এক দিকে ভয়। বহুদিন-সঞ্চিত মিথ্যা, অন্যায় ও অত্যাচার লোভের

ও স্বার্থপরতার আকারে জগতের শক্তিশালী জাতিদের গোপন-মৃত্যুর পথ তৈয়ারী করিতেছিলেন; সহসা ১৯১৪ সালে ইয়োরোপের রণ-ক্ষেত্রে ধরণীর বিষ-ব্রণের মত তাহা জাগিয়া উঠিল। অনেকের ধারণা, সেই-ই জগতের সর্ব্ব-শেষ যুদ্ধ। কহারও বা ধারণা যে, জগতের সর্ব্বশেষ যুদ্ধের সেই প্রথম আগমনী।

"স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত।" তাই সে দিন সমস্ত প্রাচী সহসা জাগিয়া উঠিয়া পশ্চিমের রক্ত আকাশের দিকে বিস্মিত আতঙ্কিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। প্রাচী'র প্রাচীন আত্মা নিদ্রার মোহ এড়াইয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—ঐরক্ত-আলো, উহা কি পশ্চিমের সভ্যতার প্রতীক্? উহারই আলো কি প্রাচীর পূর্ব্ব-গগন সমুদ্ভাসিত করিবে? পশ্চিমের রাজনীতিকেরা বিপদ গণিয়া শাস্ত্র হাতে করিয়া বলিল,—"ঐ সূর্য্য কিরণের সম্পদের ভাণ্ডার! ঐ দেবে প্রাচীর প্রাণকে ফিরিয়ে।"

সৈন্য-সংগ্রহের জন্য এই কথাই গন্য-ভাবে ইংরাজ রাজনৈতিগণ ভারতবর্ষ আয়ারল্যাণ্ড ও মিসরকে বলিয়াছিল। যুদ্ধের পর মিসরের পূর্ণ-স্বাধীনতা প্রতিশ্রুত হইয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধ অবসানের সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত মরীচিকা-লুব্ধ জাতির মোহ ক্রমশঃ কাটিয়া যাইতে লাগিল। মিসরের জাতীয় দলের প্রতিনিধি রূপে জগলুল মিসরের পূর্ণ-স্বাধীনতার জন্য দেশে বিশেষে আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। দেশের সমস্ত তরুণ ও ছাত্ররা দলে দলে আসিয়া জগলুলের পতাকার তলে আসিয়া দাঁড়াইল। ১৯১৮ সালে ১৩ই নবেম্বর জগলুল তদানীন্তন হাই কমিশনার সার জে, এন,

উইনগেটের (Sir J N Wingate) সভাপতিত্বে প্রস্তাব করেন, যে, ইংরাজ রাজনৈতিকগণের সহিত এই বিষয়ে সাক্ষাৎভাবে কথাবার্ত্তা বলিবার জন্য তিনি ইংলণ্ড যাইবেন। সভাপতি মহাশয় এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া দেন। এই ব্যাপারে ব্যাহত হইয়া জগলুল বারো জন সঙ্গী লইয়া প্যারিসের শান্তি-বৈঠকে যাইবার মানস করেন—সেখানে সর্ব্বজাতির প্রতিনিধিদের সম্মুখে মিসরের এই দাবীর কথা জানাইবার জন্য। কিন্তু মিসর পরিত্যাগ করিয়া যাইবার হুকুম তিনি পাইলেন না। এবং ১৯১৯ সালে মার্চ্চ মাসে তিনি বন্দী হন এবং মাল্টায় তাঁহাকে দ্বীপান্তরিত করা হয়।

জগলুলের দ্বীপান্তরের ফলে সমস্ত মিসরে ভীষণ আন্দোলন শুরু হইল। সাধারণ বিদ্রোহের আশঙ্কা টেমস্ নদীর ধারে গিয়া পৌঁছিল। তখন নূতন হাই কমিশনার লর্ড এলেনবী আসিয়া মাল্টা হইতে জগলুলকে কারামুক্তি প্রদান করেন।

কারামুক্ত বীরকে সমগ্র মিসর সাদরে বরণ করিয়া লইল। মাল্টা হইতে প্রত্যাগমনের দৃশ্য মেজর হ্যারি বার্নেস, এম, পি, বর্ণনা করিয়াছেন। একজন পার্লিয়ামেণ্টের ইংরাজ সভ্যের এই এই বিষয়ের বর্ণনার যথেষ্ট মূল্য আছে।

"সেই অভ্যর্থনার বিপুল উন্মাদনা দেখিতে দেখিতে আমার মনে সহসা বাইরণ ও ব্রাউনিং কথা স্মরণ পড়িল। গ্রীসে বাইরণ ব্রাউনিং বোধ হয় এই রকমই দৃশ্য দেখিয়াছিলেন—Roses, Roses all the way, Myrtle mixed in my path like

mad পথে পথে পায়ে পায়ে শুধু গোলাবের ছড়াছড়ি। সামান্ত কৃষকের সহিত সম্ভ্রান্ত পাশা পর্য্যন্ত সবাই আজ পাশাপাশি। আমার হাতে এমন কোনও কলম নাই যে, সে-দৃশ্য বর্ণনা করিতে পারি। অধিকাংশ রাস্তা আগাগোড়া কার্পেট দিয়া মোড়া—মাথার উপর গৃহ-বাতায়ন হইতে অজস্র ধারে গোলাব ফুল পড়িতেছে।"

ওধারে White Hall-এর তাঁহারা এই সমস্ত বিষয়ে কোনরূপ ভ্রূক্ষেপ করিতেছিল না। লর্ড কর্জ্জনের মত রাজনৈতিকও যখন বলিতে পারেন,—"The world is suffering in many places at the present time from the cult of a fana tical and purely disruptive type of nationalism His Majesty's Goverment will set their face against it as firmly in Egypt as elsewhere" পৃথিবীর চারিদিকে আজ-কাল জাতীয়তার একটা কদর্য্য পাগলামী ও খেয়ালীর রূপ জাগিয়া উঠিয়াছে। এ বিষয়ে ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট মিসর কিংবা অন্য কোথাও কিছু মাত্র ভ্রূক্ষেপ করিবেন না"

যে দেশের মনোভাব এই—সেই দেশ হইতেই মিসরের ব্যাপারখনা কি ও মিসর পূর্ণ স্বাধীনতার যোগ্য কিনা বিচার করিবার জন্য ইংলণ্ড হইতে এক কমিশন প্রেরিত হইল। এই কমিশনের নাম Milner Commission—মিলনার কমিশন। জগলুল এই কমিশনের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন আরম্ভ করিলেন-

কেহই যেন এই কমিশনের সম্মুখে কোনও কথা না বলেন। মিসরবাসী চায় পূর্ণ-স্বাধীনতা-মিলনার কমিশন নয়।

মিলনার কমিশনের বিরুদ্ধে জগলুলের এই আদেশে মিশরের একটী প্রাণীও মিলনার কমিশনে সাক্ষ্য দিল না আন্দোলন চালানর জন্য বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট বার বার বার জগলুল পাশাকে সাবধান করেন; কিন্তু তাহা সত্বেও জগলুল বিরত হইলেন না। ফলে ১৯২১ সালের শেষাশেষি তিনি আবার কারারুদ্ধ হন এবং সুদূর সিংহল দ্বীপে তাঁহাকে রাখা হয়। জগলুলের কারাবাসের সহিত মিসরে আন্দোলন কিছু মাত্রায় কমিয়া না গিয়া বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে বৃটীশ পার্লিয়ামেণ্ট হইতে মিসরকে নূতন শাসন প্রণালীর ও স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার দেওয়া হইল। ১৯২২ সালে ফায়াদ পাশা স্বাধীন মিশরের রাজা বলিয়া আপনাকে প্রচারিত করিলেন।

কিছুকাল ধরিয়া মিসরে অরাজকতা, হত্যা ও ছোট ছোট যুদ্ধের ব্যাপার চলিতে লাগিল। অবশেষে ১৯২৩ সালে ১৯শে এপ্রিল বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সহিত পুরাতন শাসন প্রণালীর পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন শাসন প্রণালীর প্রবর্ত্তন হইল। জগলুল কারামুক্ত হইয়া এই নূতন শাসন-প্রণালী-নিয়োজিত ব্যবস্থা সভায় প্রবেশ করিলেন। সভায় কোনও Port folio লইতে জগলুল চান নাই, কিন্তু বাধ্য হইয়া তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রীত্বের পদের জন্য দাড়াইতে হয়। তাহাতে বৃটিশ হাই কমিশনার

আপত্তি করায় তিনি সভার Chamber of Deputies প্রতিনিধি গৃহের সভাপতি রূপে অবস্থান করেন।

মিসর-বাসী এই সর্ত্তে যতখানি উল্লসিত হইয়াছিল—জগলুল তাহাতে ততখানি সন্তুষ্ট হন নাই। তিনি হয় ত ভাল রকমই জানিতেন যে, ইংরাজ কখনই মিসরের উপর সকল অধিকার ত্যাগ করিতে পারে না—তার একমাত্র কারণ Suez Canal,এই Suez Canal-ই ভারতবর্ষের প্রবেশ-দ্বারা। Suez Canal-কে সুসংরক্ষিত রাখিতে হইলে মিসরেব উপর ইংরাজের সামরিক কর্ত্তৃত্ব সম্পূর্ণরূপে থাকা চাই। বাহ্যতঃ মিসর স্বায়ত্ব-শাসন পাইল, কিন্তু জাতির সমস্ত বিশেষ অধিকারগুলির উপর British High Commissioner-এর সম্পূর্ণ অধিকার রহিল। স্বাধীন মিসরে বৃটীশের কেল্লায় বৃটিশ সৈন্য পুরামাত্রার মৌজুদ রহিল। এই ব্যাপার আলোচনা এবং মিসর হইতে বৃটীশ সৈন্য তুলিয়া লইয়া যাইবার জন্য জগলুল পাশা ইংলণ্ডের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাক-ডোনাল্ডের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য লণ্ডন গমন করেন। কিন্তু জগলুল পাশার এই আবেদন কোনও ফল-লাভ হইল না। তবে র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড বলিয়াছিলেন, যে, বৃটিশ সৈন্যেরা মিসরীয় কোনও ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবে না—তাহারা শুধু বিদেশীদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তথায় সংরক্ষিত আছে মাত্র। সুদানের আভ্যন্তরিক শান্তিরক্ষা করা ইংরাজের কর্ত্তব্য। এই আত্ম-নিয়োজিত কর্ত্তব্যের কাহিনী শুনিয়া জগলুল মিসরে ফিরিয়া আসেন।

কিন্তু ইত্যবসরে জগলুলের এই বিলাত-ভ্রমন-ব্যাপার দেখিয়া দেশের মধ্যে কয়েক জন উগ্র-মস্তিষ্ক লোক তাঁহাকে সন্দেহ করে। এক দিন তিনি যখন বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তাঁহার স্বাভাবিক রসাল ও শান্তভাবে বলিতেছেন, যে আজ এই সভায় এই জাগরণের সম্মুখে, অন্তরে যদি আমার কোনও গর্ব্ব থাকে, আল্লাহ্ নিশ্চয়ই আমার উদ্ধত শিরকে নুয়াইয়া দিবেন। সেই সময় কায়রোর এক ছাত্র জগলুলকে হত্যা করি-বার মানসে গুলি করে। জগলুল্ আহত হইয়া পড়িয়া যান, কিন্তু তখন তাঁহার স্বাভাবিক মিষ্ট ভাষায় বলিলেন,—"অল্লাহ আমার প্রার্থনা পূবণ করিয়াছেন!"

ফোয়াদ পাশার সহিত মতান্তর হওয়ার দরুণ ১৯২৪ সালে নভেম্বর মাসে তিনি ব্যবস্থাপক-সভার কার্য্যে ইস্তফা দেন, কিন্তু পুনরায় আবার সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে হয়। তখন সুদানে বিদ্রোহ মাথা তুলিয়া উঠিতেছিল। মিসরবাসী সুদানকে মিসরের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহিয়া ছিল। সুদানের এই বিদ্রোহ দমন করেন—বৃটীশ-সর্দ্দার সার লী ষ্ট্যাক। ১৯ শে নভেম্বর সার লী ষ্ট্যাককে হত্যা করা হয়। এই ব্যাপারে বৃটীশ পার্লিয়ামেন্ট অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠে এবং ইহার প্রতিবিধান হিসাবে মিসরের জাতীয় গভর্ণমেণ্টের নিকট পাঁচ লক্ষ পাউণ্ডের দাবী করিয়া এবং জগলুলকে কর্ম্মচ্যুত করিবার আদেশ দিয়া বৃটীশ পার্লিয়ামেন্ট এক অনুজ্ঞা-পত্র জারী করেন। ১৯২৫ সালে আবার যখন ব্যবস্থাপক-সভার সভ্য-নির্ব্বাচনের সময় হয়, তখন জিওয়ার পাশা জগলুলের বিরুদ্ধে দাঁড়ান। কিন্তু জিওয়ার পাশা এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হারিয়া

যান এবং ১৯২৫ সালে যে সভার পুনর্গঠন হয়, তাহাতে জগলুলই পুনরায় সভাপতি নির্ব্বাচিত হন।

জগলুলের দেহ কিন্তু এত দিনের এই অক্লান্ত পরিশ্রম সহ্য করিবার মত শক্তিশালী ছিল না। তাই তাঁহার জীবনের শেষ দিকে তিনি একেবারে ভগ্ন-স্বাস্থ্য হইয়া পড়েন। শুধু অপূর্ব্ব মানসিক বলে দেহের সমস্ত দুর্ব্বলতাকে পরাজয় করিয়া জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত মিসরের পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু যে ব্যাপারের জন্য জগলুল বৃটীশ পার্লিয়ামেণ্টের দরবারে গিয়াছিলেন তাহা আজিও হয় নাই— হইবে কি না তাহাও জানা নাই। সেদিনও ইংরাজের রণ-পোতে মিসর-কূলে আসিয়া মিসরের পূর্ণ-স্বাধীনতার সম্পূর্ণ অর্থ কি তাহা বুঝাইয়া দিয়াছে।

মিসরের দুর্ভাগ্য যে, সে সুয়েজ প্রণালীর মুখে—সুদা-নের দুর্ভাগ্য যে, তাহার মাটিতে তূলা জন্মায়; আর মিসরের আজ সব চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য যে—জগলুল নাই।

জগলুলের মৃত্যু সারা জগতের স্বাধীনতা কামীদের মনে একটা বিষাদের ছায়া আনিয়াছে। জাতিয়তার বানী প্রচারক টি, এল, ভাসওয়ানী মিসরের তরুণ দলের নেতা হিসাব জগলুল সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন—তাহা নিম্নে দেওয়া হইল।

জগলুল পাশার আত্মা আজ স্বর্গ-গত। যখন তাঁহার কথা মনে পড়ে তখন তাঁহার ছবির সঙ্গে লেনিন, কামাল ও মুসোলিনীর অপূর্ব্ব ব্যক্তিত্বের কথা মনে জাগে। ইঁহাদের নমস্কার জানাই—

কারণ ইহারা সকলেই শক্তির অমর-সন্তান। এই সঙ্গে বর্ত্তমান চীনের জন্মদাতা সান-ইয়াৎ-সেনেরও নাম উল্লেখ করা উচিত। এই পাঁচ জন মহাপুরুষ তাঁহাদের জীবদ্দশাতেই তাঁহাদের আরব্ধ কর্ম্মের ফল উপভোগ করিতে পারিয়াছেন। মুক্ত রুষিয়ার স্বপ্ন লেনিনের মৃত্যুর আগেই মূর্ত্তি ধরিয়া জাগে। যদিও তাঁহার কমিউনিষ্ট রাজ্যের আদর্শ অর্থনৈতিক দিক দিয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে, তথাপি তিনি তাঁহার জীবনে অশিক্ষিত রুষিয়াকে এক বিরাট জ্ঞান-দীক্ষা দিয়া গিয়াছেন এবং নূতন কৃষি-প্রণালী ও যন্ত্র-প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়া দরিদ্র রুষিয়াকে অর্থ-ভাণ্ডারের চাবী দিয়া গিয়াছেন। মুসোলিনী আজও জীবিত থাকিয়া ছিন্ন ইতালীর ভগ্ন দেহকে টানিয়া তুলিয়া এক সবল জাতি গড়িয়া তুলিতেছেন। আপনার শক্তিতে আপনি বলীয়ান্ অথচ জগতের সমস্ত নূতন আহ্বানে সজাগ—আজ এক নূতন তুরস্ক কামাল গড়িয়া তুলিতেছেন। সান-ইয়াৎ-সেনও প্রশান্ত মহাসাগরের কূলে চীনকে জাগিতে দেখিয়া গিয়াছেন। চীনের জাগরণকে এশিয়ার নব-জাগরণ বলা যাইতে পারে। মিসরকে আজ স্বাধীনতার রথে প্রতিষ্ঠিত করাইয়া জগলুল অমৃত-লোক-যাত্রী। আর ভারতবর্ষ—তাহার স্বরাজের রথের আগমনী এখনও কানে বাজে না—তাই তাহার স্বাধীনতার পাণ্ডারা আজ রাজনীতির ময়দানে ফুটবল-ম্যাচের হার-জিতের গণ্ডগোলের আয়োজনে ব্যস্ত।

মৃত্যুর শেষক্ষণ পর্য্যন্ত জগলুলের আধিপত্য মিসরবাসীর মনে অক্ষুণ্ণ ভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এই প্রভাবের

অক্ষুণ্ণতার একটি বিশেষ কারণ—মিসরের ছাত্রসমাজে ও তরুণদের মধ্যে জগলুলের অপ্রতিহত প্রভাব। মিসরের তরুণ ছাত্রমহল তাঁহার মধ্যে জাতিপ্রেমের এক স্পষ্ট ও সত্য রূপ দেখিতে পাইয়াছিল। তাই তাহারা তাঁহাকে হৃদয়ে তুলিয়া লইয়াছিল। তাহাদের প্রেম ও কর্ম্মশক্তি জগলুল ও তাঁহার আদর্শকে প্রাণ ও গতি দিয়াছিল। কায়রোর বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাই তাঁহার বাণীকে মিসরের দূর গ্রামান্তরে বহিয়া লইয়া গিয়াছিল। জগলুলের প্রতি মিসরের তরুণ ছাত্রদের এই শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস এক অপূর্ব্ব সুন্দর জিনিস। মিসরের ও তুর্কীর তরুণরা যে শক্তির পরিচয় জগৎকে দিয়াছে, ভারতের তরুণদের মধ্যে হয় ত তাহা নাই। ইহারা শক্তির ভাণ্ডারী হইতে পারে, কিন্তু সে ভাণ্ডার অর্গলবদ্ধ।

মিশরে ও তুর্কীতে জাতীয়তার একটা বৃহত্তর ভাবের প্রভাব আসিয়া লাগিয়াছে—যাহার প্রেরণায় ক্ষুদ্র দলাদলি বা ভেদ-জনিত গ্লানির কোনও স্থান নাই। মিসরে মুসলমানেরা জাতীয়তার সংগ্রামে ক্রিশ্চিয়ানদের সহযোগিতা আনন্দে গ্রহণ করিয়াছে। তখন ওয়েল্‌স্ প্রদেশে সোয়ানসিতে এক বক্তৃতা হয় সেখানে এক তরুণ মিসরবাসীর সঙ্গে বক্তার পরিচয় ঘটে। তাঁহার চেহারা ও বক্তৃতা শুনিয়া সেই তরুণ মিসর-বাসী তাঁহাকে সভা সমক্ষে "আমার এশিয়ার প্রবাসী ভাই!" বলিয়া আলিঙ্গন করে। এই উদার প্রেম-উদ্বুদ্ধ জাতীয়তার মধ্যে এই

বর্ণ ও ধর্ম্ম-ভেদ-রহিত মিলনের আহ্বানের মধ্যে নবীন ভারতের জাগরণের আশা লুক্কায়িত রহিয়াছে।

জাতির মঙ্গল-বাণীকে তরুণ ব্যতীত আর কে সফল করিয়া তুলিতে পারে? এক দিন জগলুল এক সভায় বক্তৃতার সময় বলেন, যে, দেশ-জননী আজ সন্তানদের কাছ থেকে শক্তির সহায়তা ভিক্ষা করিতেছেন, কিন্তু তিনি নিঃসন্তান—দেশ-জননীর আহ্বানে তাঁহার পুত্রকে তিনি পাঠাইতে পারিলেন না। জগলুলের এই কথা শুনিয়া সহসা সভার এক দিক হইতে কাহারা বলিয়া উঠিল,—"কে বলে, আপনি নিঃসন্তান! আমরা সবাই তো আপনার সন্তান! জননীর আহ্বানে আমরাই তো যাবো অগ্রে!" দেখিতে দেখিতে ক্রমশঃ সভার চারিদিক হইতে তরুণের দল সেই একই কথা উচ্চারণ করিয়া অগ্রসর হইয়া আসিল।

মিসরের তরুণরাই তাহাদের অপূর্ব্ব ত্যাগ-শক্তি ও কর্ম্মনিষ্ঠা দিয়া অসংখ্য অত্যাচার ও নিপীড়নের মধ্যে জগ্লুলের পতাকাকে সগৌরবে বহন করিয়া ফিরিয়াছিল। কত যুবক হাসিতে হাসিতে কারাগারে প্রবেশ করিয়াছে—অকম্পিত-পদে ফাঁসীর মঞ্চে উঠিয়াছে। চীনেও জাতীয় আন্দোলনের মূলে রহিয়াছে তরুণ ছাত্রের দল; এবং আমার এখনও দৃঢ় বিশ্বাস, যে, তরুণদের হাতেই ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। জাতির এই নিদারুণ দুর্দ্দিনের দিনে, জানি, অন্তর অবসন্ন হইয়া আসে, কিন্তু তবুও মনে হয় আমাদের দেশের যুবকদের মনে এখনও আদর্শের

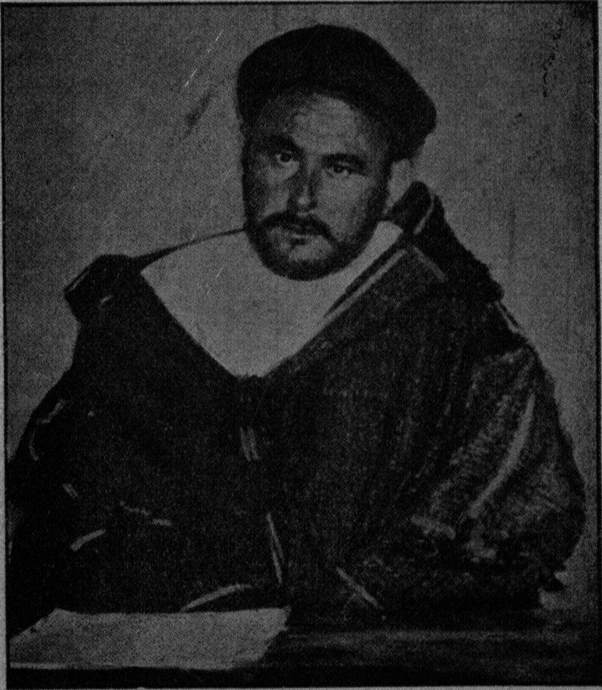
মহিমা অক্ষুণ্ণরূপে বিরাজ করিতেছে। তাহাদের আত্মা আজও বন্ধন-শৃঙ্খল পরে নাই।"

জগলুল্ স্বর্গগত; কিন্তু তাঁহার মৃত্যুবাণী আজ যেন প্রত্যেক মিশরীয় যুবকের কাণে অহরহ বাজে—"আনন্দে আজ মৃত্যুর পথে চলিয়াছি—একজন জগলুল্ মরিয়া গেল—কিন্তু পিছনে এক কোটী চল্লিশ লক্ষ জগলুল বাঁচিয়া রহিল।"

আব্দুল করিম ও সাম্রাজ্যবাদ

১

সাম্রাজ্যবাদ আজ পুরুভুজের বাহুর মত বিশ্বকে আঁকড়িয়া ধরিয়াছে। মহা-যুদ্ধের এত বড় উদাহরণের পরেও সাম্রাজ্যবাদী জাতিদের চেতনা হইল না; বরং আপনারা রণ-শ্রান্ত ও অর্থবলহীন হইয়া মহা যুদ্ধের পর সাম্রাজ্যবাদী জাতিরা জগতের ক্ষুদ্র ও পরাধীন জাতিদের প্রতি আর ও রুদ্র হইয়া উঠিল। মহাযুদ্ধের পর দেখা যাইতেছে যে, যে সমস্ত জাতি মহাসমরের গ্লানি হইতে দূরে থাকিয়া আপনার দারিদ্র্যকে ডাকিয়া আনে নাই অথবা যেখানে যুদ্ধের রসদ যোগাইতে জাতির সমস্ত ধনবল নিঃশেষ হইয়া যায় নাই সেইখানেই আবার গণ্ডগোলের সূত্রপাত হইয়াছে।



আবদুল করিম

য়ুরোপের শ্যেন দৃষ্টি সর্ব্বদাই চাহিয়া আছে কোথায় কোন প্রদেশে খনি মাটীর ভিতর রহিয়াছে, কোথায় তখনও ভূমি উর্ব্বরা এবং পর্য্যপ্ত কাঁচা মাল দিতে পারে।

ক্ষুদ্র রীফে য়ুরোপের সম্রাজ্যবাদী দুই মহাশক্তি, ফরাসী ও স্পেন, যাহা করিল তাহার পিছনে ও এই লোভ, এই পরধনলোলুপতা। রীফের দুর্ভাগ্য তাহার মধ্যে প্রচুর কয়লার খনি বিদ্যমান।

স্পেন এবং ফরাসী নানা উপায় অবলম্বন করিয়া রীফে ব্যবসা করিতে আসিয়া রীফকে অর্থবলে মুঠার মধ্যে করিয়া আনিল। রীফের সমস্ত ব্যবসা, তাহার ভূমির সমস্ত শস্য, খনির সমস্ত ঐশ্বর্য্য স্পেনের করতলগত হইল। কয়লার লোভে জর্ম্মানী ও আসিয়াছিল কিন্তু স্পেনের সঙ্গে প্রতিযোগীতায় না পারিয়া তাহাকে বিদায় লইতে হয়।

আলী হুসেইমাস উপসাগরের নিকটবর্ত্তী প্রদেশে কয়লার খনি প্রচুর পরিমাণে ছিল। সেখানে অবাধ গতি রাখিতে হইলে রীফের তেফাসিত নামক স্থান অধিকারে থাকিলে সুবিধা হয়। ১৯২০ সালে স্পেন জোর করিয়া সে স্থান দখল করিল। ক্রমশঃ স্পেনীয়দের লোভ বাড়িয়া চলিল। তাহারা রীফ সর্দ্দারদের ঘুষের প্রলোভন দেখাইয়া হাত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু রীফরা আরব তাহাদের রক্তে মরুভূমির উষ্ণ বাতাস বয়। তাহারা সামান্য হইলেও স্পেনের এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে তরবারি লইয়া দাঁড়াইবার সঙ্কল্প করিল।

এখানে রীফের অবস্থায় কথা বলা প্রয়োজন। আফ্রিকার মরক্কো প্রদেশ ফ্রান্স ও স্পেনের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা হইয়া যায়। উত্তরের অংশ স্পেনের, দক্ষিণের অংশ ফ্রান্সের। এই উত্তরাংশের মধ্যেই রীফ অবস্থিত। কোন ও রকমে এই সামান্য প্রাদেশটী তাহার স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া বাচিয়াছিল।

যখন স্পেনের অত্যাচার ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছিল তখন ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে আবদুল করিম রীফে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জীবন কাহিণী সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা নাই। সম্প্রতি রি ইউ-নিয়ান দ্বীপের নির্ব্বাসনে থাকিয়া আবদুল করিম তাঁহার আত্ম-কাহিনী লিখিয়াছেন কিন্তু সে পুস্তক এখন রি-ইউনিয়ান দ্বীপের মধ্যে বন্দী।

আবদুল করিমের পিতার নাম আমীর আবদুল করিম। তিনি রীফ প্রদেশের একজন জমিদার ছিলেন। আবদুল করিমেরা দুই ভাই। আবদুল করিম তাঁহার প্রথম শিক্ষা ফেজের মাদ্রাসা হইতে পান। কয়েক বৎসর পর অধ্যয়ন শেষ করিয়া তিনি গৌরবের সহিত এখানকার শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে উচ্চশিক্ষা ও বিজ্ঞানশিক্ষার জন্য আবদুল করিম ফ্রান্সে ও স্পেনে আসেন। এখানে আসিয়া পাশ্চাত্য ভাষারও অনুশীলন করেন। ফ্রান্সে ও স্পেনের নানা বিশ্ব বিদ্যালয়ে আবদুল করিম পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। পরে তিনি মাদ্রিদের বিখ্যাত সামরিক বিদ্যালয়ে সমর বিদ্যা ও আয়ত্ব করেন। রীফের ভবিষ্যৎ নেতা হইবার জন্যই যেন সমস্ত

পশ্চিমের সমস্ত বিদ্যা ও বিজ্ঞান শক্তি আহরণ করিয়া ছিলেন। এমন সময়ে স্বদেশ হইতে পিতার মৃত্যু সংবাদ আসিল। তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে পশ্চিমের শিক্ষাশালা পরিত্যাগ করিয়া রীফে ফিরিয়া আসিতে হয়। ইহার কিছুকাল পরেই মেলিলা বন্দরে স্পেনীয়দের অধীনে তিনি একটী সরকারী পদগ্রহণ করেন।

স্পেনের অত্যাচারে ও অর্থ-পীড়নে তখন সমগ্র রীফ আর্ত্তনাদ করিতেছিল। মেলিলা বন্দরেই তখন স্পেনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের জন্য একটী গোপন সমিতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। স্বদেশের অসহায় অবস্থায় বিচলিত হইয়া পশ্চিমের শিক্ষা-দীক্ষায় ও সামরিক নিয়মে কুশল আবদুল করিম এই দলে যোগদান করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই বিদ্রোহ কার্য্যকরী হইয়া উঠিল না।

স্পেনীয় সৈন্য অনায়াসে এই বিদ্রোহীর দলকে ছত্রভঙ্গ এবং ইহার নেতাদের বন্দী করিয়া ফেলিল। আবদুল করিমও বন্দী হইয়া কারারুদ্ধ হন। কিন্তু এই অসম দুঃসাহসী আরব কারাগার হইতে পলাইয়া গোপনে রীফে উপস্থিত হইলেন। রীফে উপস্থিত হইয়াই তিনি সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। রীফ্-বাসীরা শান্ত কৃষি-জীবন যাপন করিত—পশ্চিমের বিজ্ঞান-চালিত যুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার তাহাদের শক্তি ও সামর্থ্য কোথায়? কিন্তু আবদুল করিম এই হলধারীদের হাতে বন্দুক দিলেন, য়ুরোপের সামরিক নিয়মে ইহাদের গড়িয়া তুলিলেন। য়ুরোপ হইতে গোপনে অস্ত্রশস্ত্র আনাইয়া প্রকাশ্য ভাবে স্পেনীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। জগৎ হাসিয়া উঠিল। সামান্য

রীফ. কিনা স্পেনের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে! কিন্তু রীফ্ স্পেনের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিল। এবং সমস্ত জগৎ জানে সেই দুর্দ্ধর্ষ আরব-নেতার বিক্রমের কথা। বারে বারে স্পেন আক্রমণ করিয়াছে—বারে বারে ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে। অবশেষে স্পেন ক্ষুদ্র রীফের নিকট পরাজিত হয় এবং বহু কামান ও অস্ত্র শস্ত্র রীফের দখলে আসে।

স্পেনকে পরাজিত করিয়া আবদুল করিম রীফে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং সর্ব্ববাদিসম্মতি ক্রমে তিনিই হইলেন—রীফ গণতন্ত্রের প্রধান সেনাপতি।

(২)

যুদ্ধে পরাজিত হইয়া স্পেন নিরস্ত হইল না। অপমানে ক্ষুব্ধ হইয়া এক বিরাট বাহিনী লইয়া তাহারা আবার রীফ আক্রমণ করে। কিন্তু এই যুদ্ধ কৌশলে আবদুল করিম সমস্ত স্পেনীয় সৈন্যদের ঘিরিয়া ফেলিয়া—তাহাদের নিদারুণ ভাবে পরাজিত করেন। এই সংবাদে স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। স্বয়ং প্রধান মন্ত্রী এবং বর্ত্তমান য়ুরোপের অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সামরিক-নেতা জেনারেল প্রাইমো ডিরিভেরা মরক্কোয় আসিলেন।

কিন্তু নির্ভীক সৈনিক আবদুল করিম অনুজ্ঞা প্রচার করিলেন—যদি স্পেন রীফ দখল করে—যেন একটীও আরব-শিশু বাঁচিয়া না থাকে।

এই মৃত্যু-পণের সম্মুখে স্পেন আবার পরাজিত হইল। বহু সৈন্যও বন্দী হইল। বারে বারে এই পরাজিত হইয়া স্পেন ক্লান্ত হইয়া পড়িল এবং সন্ধির আয়োজন করিতে লাগিল। য়ুরোপীয় দুই তিনটী শক্তি মধ্যস্থ রহিল। আবছুল করিম তদানীন্তন ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাক্‌ডোনাল্ডের কাছে এই সন্ধির বিষয়ে এক পত্র লিখিলেন।

"স্বদেশ ও স্বজাতির স্বাধীনতার জন্য মৃত্যুকে পণ করিয়া যুদ্ধ করিয়া আসিয়াছে। স্পেন বার বার আমাদের পরাধীনতার শৃঙ্খলে বাঁধিতে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু আজ সে সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছে। রীফের গৌরবের বিন্দুমাত্র হানি হয়—এমন কোনও সর্ত্তে আমি রাজী নই—তাহার চেয়ে এই ক্রমান্বয় যুদ্ধই ভাল। য়ুরোপ যদি আমাদের স্বাধীনতার জন্মগত অধিকারকে স্বীকার করিয়া না'লন—তাহা হইলে রীফে যতদিন পর্য্যন্ত একটী শিশুরও দেহে প্রাণ থাকিবে—ততদিন পর্য্যন্ত রীফ স্পেনের বিরুদ্ধে লড়িবে।"

সন্ধির সর্ত্ত অনুযায়ী স্পেনীয় গভর্ণমেণ্টকে চল্লিশ লক্ষ টাকা দিয়া বন্দী সৈন্যদের উদ্ধার করিতে হয়।

স্পেনের এই নিদারুণ পরাজয়ে অপমানিত হইয়া স্পেনের জনসাধরণ বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টের প্রতি আস্থাহীন হইয়া উঠিল।

স্পেনে বিদ্রোহ মাথা তুলিয়া উঠিতে লাগিল। প্রকাশ্য রাজপথে আক্রমণ চলিতে লাগিল। এবং তাহার সঙ্গে বোমাও ফাটিতে লাগিল। কিন্তু স্পেনীয় গভর্ণমেণ্ট কারারুদ্ধ করিয়া ও

ফাঁসী দিয়া কিছুকাল পরেই এই বিদ্রোহকে দমন করিয়া ফেলেন।

(৩)

তখন দক্ষিণ আমেরিকার Beunos Aires প্রদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা তাহাদের গণতন্ত্রের শতাব্দিক উৎসবে রীফ গণতন্ত্রের সভাপতি আব্‌দুল করিমকে আহ্বান করেন। আব্‌দুল করিম রাজনৈতিক কারণে স্বাধীনতার সে উৎসবে যোগদান করিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু তিনি যে বার্ত্তা সেখানে পাঠাইয়াছিলেন, এখানে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল। এই পত্র হইতে বোঝা যায় যে, রীফ-নেতা আব্‌দুল করিম এক জন অসভ্য, মরুভূবাসী দস্যু নন—যে কোনও সুসভ্য দেশের জননেতার পাশে তাঁহার আসন হইতে পারে।

"আপনাদের স্বাধীনতার স্মরণ-উৎসবে আমন্ত্রণলিপির উত্তর দিতে আমার প্রাণ গর্ব্বে ও আনন্দে ভ'রে আসছে।

"প্রত্যেক জাতির, জাতিগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আপনাদের শাসনপ্রণালী গ'ড়ে তুলবার অধিকার পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে পবিত্র অধিকার এবং এ অধিকারের মধ্যে অন্য কাহারো হস্তক্ষেপ করা পাপ।

"এক শো বছর আগে আপনাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে ভাবে অনুপ্রাণিত হ'য়ে স্বদেশের স্বাধীনতা অর্জ্জন ক'রে গেছেন, সেই

একই ভাব আজ এই ক্ষুদ্র রীফ প্রদেশে আমাদের মনে আলোড়ন এনেছে—তারই প্রেরণায় জীবনের একমাত্র কাম্য স্বাধীনতার জন্য জীবন ও ধন সমর্পণ ক'রেছি।

"গত মহাযুদ্ধ ইয়োরোপের অন্তরকে বিষাক্ত ক'রে তুলেছে; শোষণ-নীতির প্রেরণায় রাজ্যলোলুপতা তাকে একেবারে অন্ধ ক'রে দিয়েছে। নৈতিক অনাচারে ইয়োরোপের সর্ব্বাঙ্গ কলঙ্কিত। তবুও তার বিশ্বাস যে, তার উদার অকলঙ্ক সভ্যতা জগতের অন্যান্য জাতিকে নিতেই হবে।

"আমরা চাই ভবিষ্যতের মানবসমাজ গ'ড়ে তুলতে শান্তি ও শৃঙ্খলার ভিত্তিতে। মরুচারী আরব আমরা—আমরা বিদেশীদের বন্ধন থেকে মুক্ত হ'তে চাই। মিসরের সহযাত্রী ভাইরা আমাদের আগেই যাত্রা শুরু ক'রেছে—আমরাও আজ মরক্কোতে সেই পথে চ'লেছি। হয় ত সময় এল—মুক্তির সময় এল, এলজিয়ার্স জাগবে, টিউনিস্ জাগবে, ত্রিপোলী জাগবে।

"আমাদের এই সংগ্রাম বা দাবীর পেছনে কোনও অন্যায় অথবা পাপ নেই। স্পেন জাতির প্রতি আমরা যে ঘৃণাবশে এ আন্দোলন শুরু করেছি—সে কথা একেবারে মিথ্যা। আমরা কেমন ক'রে ভুলি যে, এই ভূমি এক দিন আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের ক্রীড়ানিকেতন ছিল। কোন্ শিক্ষিত স্পেনবাসী জানে না যে, তাহাদের কলা ও শিল্পের গৌরবের যুগে যারা উজ্জ্বল হ'য়ে ছিল, তাদের অধিকাংশই আরব। আমাদের জ্ঞান ও কলাশিল্প দিয়ে যে ভূমিকে অলঙ্কৃত ক'রেছিলাম, আমাদের শ্রম দিয়ে যে ভূমিকে

সুরসাল করেছিলাম—আমাদের বহিষ্করণের সঙ্গে সঙ্গেই সে ভূমিতে তন্দ্রা ও জড়তা নেমে আসে।

"আপনারা যে স্পেনীয়দের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন (কারণ তারা আপনাদের স্বাধীনতা স্বীকার করেছে) তার জন্যে মনে করবেন না যে আমি আপনাদের স্পেনীয়দের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করছি। আমার সহানুভূতিকে, আশা করি, ভুল বুঝবেন না।"

(৪)

স্পেনতো চলিয়া গেল কিন্তু ক্ষুদ্র রীফের মুক্তি নাই। ফরাসী গণ-তন্ত্র আবদুল করিমের ব্যাপার দেখিয়া আশঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। য়ুরোপের সমস্ত জাতির চেয়ে ফরাসী জাতি বেশী করিয়া জানে যে স্বাধীনতার উত্তেজনার মত ছোঁয়াচে রোগ আর নাই। যদি এই রীফ-সর্দ্দারের পন্থা অনুসরণ করিয়া তাঁহাদের অধিকৃত টিউনিস্ জাগিয়া উঠে, যদি ত্রিপোলী জাগিয়া উঠে। জয়-মত্ত আমীর যদি সেখানেও বিদ্রোহের বীজকে ফুটাইয়া তোলে। বিরাট ফরাসী রাজ্য দুলিয়া উঠিল। ফ্রান্সের নিশীথ আতঙ্ক দূর করিবার জন্য রীফের পরাধীনতা একান্ত প্রয়োজনীয়। সুতরাং ফরাসী ও রীফে আবার যুদ্ধ বাধিল। সেই ক্ষুদ্র প্রদেশের জনবিরল সৈন্য-মণ্ডলীর অপূর্ব্ব বীর নেতা আবদুল করিম ফ্রান্সের বিরুদ্ধে বাধ্য হইয়া দাঁড়াইলেন। আবদুল করিম অসহায় অবস্থায় সামান্য শক্তি লইয়া যে বীরত্বের ও স্বাধীনতাস্পৃহার পরিচয় দিয়াছেন—তাহা বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে বিরল।

ফ্রান্সকে প্রথমে বিধ্বস্ত হইয়া ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল। এত বেশী সৈন্যক্ষয় হয়—যে দেশে আন্দোলন চলিল যে রীফের বিরুদ্ধে এ যুদ্ধ বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী ফ্রান্সের নিকট সে কথার কোনও অর্থ হইল না। বহু অর্থ ব্যয় ও প্রাণহানি করিয়া য়ুরোপের অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তি আবদুল করিমকে পরাজিত করে।

জনবিরল রি-ইউনিয়ান দ্বীপের এক প্রাচীন প্রাসাদে রীফ্ নেতা আবদুল করিম ফরাসীদের হাতে বন্দী হইয়া আছেন। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণীর প্রচারক সুসভ্য ফরাসী জাতি এমনি করিয়া সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার দাম দিল।

(৫)

তিনি যে দুর্গে বন্দী হইয়া আছেন—তাহার নাম Chateaux Morange দুর্গটী অত্যন্ত প্রাচীন, বহুস্থলে একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সেইখানে সপরিবারে আবদুল করিম বন্দী-জীবন যাপন করিতেছেন।

সম্প্রতি এক জন সংবাদ-পত্রসেবী তাঁহার সহিত দেখা করিতে যান। তিনি আবদুল করিমকে জিজ্ঞাসা করেন যে, রি-ইউনিয়ান দ্বীপ তাঁহার কেমন লাগিতেছে। তার উত্তরে তিনি বলেন যে, তিনি এদ্বীপের কিছুই দেখেন নি।

"কিন্তু এই দুর্গ এবং এর আশে পাশের জায়গা তো বেশ সুন্দর ?—"

আবদুল করিম উত্তর দেন,—"এ দুর্গ ভগ্নপ্রায়—এর বাতাস অস্বাস্থ্যকর।"

"এখনকার পার্ব্বত্য দৃশ্য আপনার জন্মভূমির মতই কতকটা ......আপনার বোধহয় ভাল লাগে না—"

"আমি বন্দী; বন্দীর আবার ভাল লাগা! কোন্ বন্দীর অন্তরে সুখের অনুভূতি থাকে? বহু দূরে আজ বহু দূরে আমার রীফ—আমার দেশবাসী—এর চেয়ে দুঃখের আর কি হ'তে পারে!"

"কিন্তু আপনি যুদ্ধে যে বীরত্ব দেখিয়েছেন"—মুহূর্ত্ত মধ্যে বন্দীর মুখ উজ্জল হইয়া উঠিল।

"আমি তো স্পেনীয়দের এক রকম পরাজিত করিয়াই ছিলাম কি অধিকার অছে তাদের আমার দেশে প্রবেশ করবার? দস্যুর চেয়ে অধম তারা—আমার রীফের স্বাধীনতা তারা জোর ক'রে কেড়ে নিতে চায়। রীফবাসীরা শেষ পর্য্যন্ত প্রাণপাত ক'রে যুদ্ধ ক'রেছে, কিন্তু শেষে ফরাসীদের সৈন্য-সংখ্যায় আমরা হেরে গেলাম!"

সংবাদ-পত্রসেবী যখন বিদায় গ্রহণ করেন, তখন এক জন ফরাসী সেনা-নায়ক তাঁকে বলেন, "আবদুল করিম ভয়ানক সাহসী আর বুদ্ধিমান লোক। তাদের আশঙ্কা যে, কোন দিন হয় ত আবদুল করিম এই দ্বীপ থেকে পালিয়ে আবার রীফে গিয়ে উঠবে।"
